রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়ার কল্যাণ আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে। আর আল্লাহ্‌ সব কিছু শোনেন, দেখেন।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে নারী ও ইয়াতীম সম্পর্কিত হুকুম-আহ্‌কাম বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এখানে কোরআনের বর্ণনারীতি অনুসারে আশ্বাস ও ভীতির বাণী বর্ণনা করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে সবই (একমাত্র) আল্লাহ্‌ তা'আলার (জন্য; অতএব এহেন পরাক্রমশালী পরওয়ারদেগারের নির্দেশ পালন করা একান্ত কর্তব্য)। আর (আনুগত্য স্বীকার করার এ নির্দেশ শুধু তোমাদেরকেই বিশেষভাবে দেওয়া হয়নি, বরং) পূর্ববর্তী আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইয়াহুদী নাসারাগণ) এবং তোমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছি, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (যাকে তাকওয়া বলা হয় এবং সর্বপ্রকার বিধি-নিষেধ মান্য করা যার অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য এ সূরায় اِتَّقُوْا "তাকওয়া অবলম্বন কর" বলে এরই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আর তাদেরকে ও তোমাদেরকে এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে,) যদি তোমরা অবাধ্য হও, (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার আদেশ-নিষেধ লংঘন কর, তবে তাঁর কোনই ক্ষতি হবে না, বরং তোমাদেরই সর্বনাশ হবে। কারণ) আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। (ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের অবাধ্যতায় এত বড় পরাক্রমশালী প্রভুর কি ক্ষতি হবে? অবশ্য যে কেউ এত বড় শাহানশাহের বিরুদ্ধাচরণ করবে, তারই চরম সর্বনাশ হবে) আর আল্লাহ্‌ তা'আলা কারও (আনুগত্যের) মুখাপেক্ষী নন। (বরং আল্লাহ্‌ স্বীয় সত্তায়) প্রশংসিত ও (সর্বগুণে গুণান্বিত। কাজেই কারও অবাধ্যতা বা বিরোধিতার কারণে তাঁর মহিমার কোন হানি হয় না।) আর আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। আর (যেহেতু তিনি অনন্যনির্ভর পরম পরাক্রমশালী, অতএব, স্বীয় অনুগত বান্দাদের) কার্য নির্বাহের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলাই যথেষ্ট। (তাঁর সহায়তা ভিন্ন তাঁর অনুগত বান্দাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে---এমন কোন শক্তিই নেই। অতএব, অন্য কাউকে ভয় করা বা কারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ করাও অন্যায়। আর) হে মানবকুল (আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের সুখ-শান্তি ও কল্যাণের জন্যই তোমাদেরকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ শিক্ষা দিচ্ছেন। অন্যথায়) তিনি তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে অন্যদের নিয়ে আসতে পারেন (এবং তাদের দ্বারা স্বীয় ইবাদত করাতে পারেন) আল্লাহ্‌ তা'আলার এমন ক্ষমতা রয়েছে।

(যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা অবাধ্য হও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতি সৃষ্টি

করবেন, যারা তোমাদের মত অবাধ্য হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তা অনায়াসে করতে পারেন। এতদসত্ত্বেও তিনি তোমাদের সংশোধনের সুযোগ দান করেছেন। এটা তাঁর নিছক অনুগ্রহ। অতএব, একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার কর এবং সৌভাগ্য অর্জন কর। আর) পার্থিব প্রতিদান যদি কেউ কামনা করে করুক; (কিন্তু মনে রেখো---দীনী কাজের সত্যিকার প্রতিদান আখেরাতেই লাভ হয়। ইহ-জীবনে কোন সৌভাগ্য বা সুফল পাওয়া না গেলে দুঃখ বা দুশ্চিন্তা করো না, বরং) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে (অর্থাৎ তাঁর অসীম ক্ষমতার আয়ত্তাধীনে রয়েছে) দুনিয়া ও আখিরাতের (যাবতীয়) প্রতিদান। (উচ্চ ও নিম্ন মানের যাবতীয় প্রতিদান যখন তাঁর ক্ষমতাধীন, তখন তাঁর কাছে উচ্চ মানের প্রতিদানই প্রত্যাশা করা বাঞ্ছনীয়।) আর আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু শ্রবণ করেন ও লক্ষ্য রাখেন। (সবার আবেদনই তিনি শোনেন; তা দুনিয়ার জন্য হোক বা আখিরাতের জন্যই হোক। সবার মনোভাব তিনি লক্ষ্য রাখেন। আখিরাত কামনাকারীদের তিনি আখিরাতে পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং দুনিয়াতেও আংশিক দান করেন। পক্ষান্তরে দুনিয়া প্রার্থীদেরকে আখিরাতে বঞ্চিত করবেন। সুতরাং কোন ইবাদতের মধ্যে পার্থিব লাভের উদ্দেশ্য নিহিত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে পার্থিব প্রয়োজনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ্র কাছে চাওয়া দূষণীয় নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ - অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার। এখানে এই উক্তিটির তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্র সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারে অভাবহীনতা। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ্ তা'আলার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ্ পাকের অপার রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য করো, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন, রহমত বর্ষণ করবেন এবং অনায়াসে তা সুসম্পন্ন করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অবাধ্যদের পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনন্যনির্ভরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অবাধ্যদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى
اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ

أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

(১৩৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কেই অবগত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ! (প্রাপ্য পরিশোধের সময়, বিচার-মীমাংসাকালে ও যাবতীয় লেন-দেনের মধ্যে) ন্যায়-নীতির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। (স্বীকারোক্তি বা সাক্ষ্য দান-কালে) আল্লাহ্ তা'আলার (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য (সত্য) সাক্ষ্য দান করো, যদিও (উক্ত সাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তি তোমাদের) নিজেদের বা পিতা-মাতার অথবা আত্মীয়-স্বজনের (স্বার্থের) পরিপন্থী হয়। (আর সাক্ষ্যদানের সময় এরূপ খেয়াল করো না যে, যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে হবে) সে যদি ধনী ব্যক্তি হয় (তবে তার সাথে সৌহার্দ্য বিনষ্ট করা কিংবা শত্রুতা সৃষ্টি করা উচিত নয়।) অথবা সে যদি দরিদ্র হয়, তার ক্ষতি করা অনুচিত। (তোমাদের সাক্ষ্য দানকালে কোন পক্ষের প্রাচুর্য বা দারিদ্র্যের প্রতি বা ক্ষতি বা লাভের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ করো না। (কারণ যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হবে) সে ধনী বা দরিদ্র যা-ই হোক না কেন, তাদের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক (তোমাদের চেয়ে) নিকটতর। (কেননা তোমাদের সম্পর্ক খোদাপ্রদত্ত। কিন্তু খোদার সম্পর্ক কারো প্রদত্ত নয়। শক্তিশালী সম্পর্ক সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কল্যাণার্থে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সাক্ষ্য দানকালে অকপটে সত্য কথা বলতে হবে, যদি তাতে সাময়িকভাবে কোন পক্ষের ক্ষতিও হয়। এমতাবস্থায় তোমাদের দুর্বল সম্পর্কের বাহানা দিয়ে কারো সাময়িক উপকারার্থে সত্য সাক্ষ্য গোপন করা অপরাধ হবে। অতএব,) তোমরা (সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কোনরূপ) প্রবৃত্তির দাসত্ব করো না। (আর) যদি তোমরা সাক্ষ্য বিকৃত করো কিংবা সাক্ষ্যদানে বিমুখ হও, তবে (স্মরণ রাখবে,) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সমুদয় কীর্তিকলাপ সম্পর্কেই অবহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার বুকে নবী প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

'সূরা-নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর অটল

থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্য দান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা-সমূহও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়েদা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত রয়েছে। সূরা মায়েদার আয়াতের বিষয়বস্তু এমন কি শব্দাবলীও প্রায় অভিন্ন। সূরা হাদীদের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত আদম (আ)-কে প্রতিনিধি-রূপে দুনিয়ায় পাঠানো, অতঃপর একের পর এক নবী প্রেরণ এবং শতাধিক সহীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গণ্ডির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসিহত, তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে যেসব অবাধ্য লোককে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনা যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি দান করে সৎপথে আসতে বাধ্য করা হবে।

সূরা হাদীদের ২৫তম আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি স্বীয় রসূলদের প্রকাশ্য প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মাপকাঠি অবতীর্ণ করেছি যেন তারা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর আমি লৌহ অবতীর্ণ করেছি যার ভেতরে রয়েছে বিপুল ক্ষতি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ ও সুফল।

এতদ্বারা বোঝা গেল যে, নবী ও রসূলদের প্রেরণ এবং আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করার বিরাট আয়োজন প্রধানত ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির খাতিরেই করা হয়েছে। পরি-শেষে লৌহ অবতীর্ণ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সকল মানুষকে ন্যায়-নীতির উপর স্থির রাখার জন্য শুধু উপদেশ ও নীতিবাক্যই যথেষ্ট হবে না, বরং কিছু দুষ্ট লোক এমনও থাকবে যাদেরকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে এবং লৌহাস্ত্রের ভীতি প্রদর্শন করে সৎপথে আনতে হবে।

ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেক নাগরিকেরই ব্যক্তিগত দায়িত্বও বটে

সূরা মায়েদার ৮ম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ন্যায্য সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে যাও, কোন গোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়নীতি হতে বিচ্যুত না করে। এটাই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

সূরা নিসা, সূরা হাদীদ ও সূরা মায়েদার উপরোক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকে এবং অন্যকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় সরকার ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। তা হচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরা তো ন্যায়নীতির ধার ধারবেই না, বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দেবে না ; তখন তাদেরকে দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারী ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সুধীরাও মনে করেন যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু সরকার ও আদালতেরই দায়িত্ব। এ ব্যাপারে জনগণের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এহেন ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও জনগণ দু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ও অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের জনগণ সরকারের কাছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি দাবী করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়নীতি পালন করতে প্রস্তুত নয়। এরই কুফল আজ সারা বিশ্বকে গ্রাস করেছে। আইন-কানুন নিষ্ক্রিয় ও অপরাধ-প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আজকাল সব দেশেই আইন প্রণয়নের জন্য এসেম্বলী রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর তার সদস্য মনোনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে। অতঃপর নির্বাচিত সদস্যরা দেশবাসীর মন-মানসিকতা, আবেগ-অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করে থাকেন। তারপর জনমত যাচাই করার জন্য তার প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর সেটা কার্যকরী করার জন্য সরকারের অসংখ্য প্রশাসনযন্ত্র সচল হয়ে উঠে, যার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন দেশের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ।

দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তাঁরা সক্রিয় কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করছেন। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও প্রচলিত তন্ত্র-মন্ত্রের মোহমুক্ত হয়ে, তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঠিকাদারদের অন্ধ অনুকরণের উর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে,

نگاہ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے۔
مری نظروں میں پھیکا رنگ محفل ہوتا جاتا ہے۔

—সবাই দেখছে ক্রমে উজ্জ্বলতা ও উন্নতি বাড়ছে

অথচ আমি দেখছি বিশ্বের দুর্গতি ও অবনতিই কেবল বাড়ছে।

আজ থেকে এক শ' বছর আগেকার অবস্থা তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করুন। তথ্য ও পরিসংখ্যান সংরক্ষিত রয়েছে। তা স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে যে, আইন-কানুনের বেড়াজাল যত বিস্তৃত হয়েছে, আইনের মধ্যে মানবীয় চাহিদার যতই প্রতিফলন ঘটেছে, আইন প্রয়োগ করার জন্য প্রশাসন যন্ত্রের পরিধি যতই বিস্তৃত হয়েছে, এক প্রকার পুলিশের স্থলে বিভিন্ন প্রকার পুলিশের যতই উদ্ভব হয়েছে, দিন দিন ততই অপরাধের খতিয়ানও দীর্ঘ হয়েছে, মানুষ ন্যায়নীতি হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং একই গতিতে পৃথিবীর বুকে অশান্তি ও নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেয়ে চলছে।

আল্লাহ্-ভীতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তির চাবিকাঠি ঃ সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি চলমান সমাজের প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রসূলে-আরাবী (সা)-র আনীত পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, শুধু আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না, একমাত্র আল্লাহ্-ভীতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে, যার ফলে রাজা-প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব উপলব্ধি করতে ও তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনসাধারণ একথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের কাজ। কোরআন-মজীদের পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহ ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক বৈপ্লবিক বিশ্বাসের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াতের শেষে আছে ঃ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

সূরায়ে মায়েদার শেষে আছে ঃ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ "নিশ্চয় আল্লাহ

তা'আলা অবহিত আছেন তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে।" সূরায়ে হাদীদের আয়াতের শেষে আছে ঃ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ- 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।'

উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল-অনড় থাকা এবং অন্যকেও অটল রাখার চেষ্টা করার জন্য শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতসমূহের শেষ দিকে এমন এক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যা মানুষের ধ্যান-ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহাবিপ্লবের সূচনা করতে পারে। তা হ'ল, আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম, তাঁর সম্মুখে উপস্থিতি ও জবাবদিহি এবং প্রতিদান ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে এক শ' বছর পূর্ববর্তী অশিক্ষিত বিশ্বাসী লোকেরাও বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করতো এবং যার অভাবের কারণেই আজকের মহাশূন্যের অভিযাত্রী, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী উন্নত বিশ্ববাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারী ও তন্ত্র-মন্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে তারা হয়তো মহাশূন্যে আরোহণ করতে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াতে এবং মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কারখানা, উপাদান-উপকরণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথাও পাবে না। কোন অত্যাধুনিক আবিষ্কারের মাঝে কিংবা কোন গ্রহ-উপগ্রহেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না, বরং পাওয়া যাবে একমাত্র রসূলে-আরাবী (সা)-র পয়গাম ও শিক্ষার মধ্যে, আল্লাহ্-ভীতি ও আখিরাতের বিশ্বাসের মধ্যে। ইরশাদ হয়েছে ঃ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ---অর্থাৎ মনে রেখো, একমাত্র আল্লাহ্র স্মরণের মধ্যেই অন্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত কুদরত ও কল্পনাতীত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে ভাস্বর করে চলেছে, যার সামনে মানুষ তার অক্ষমতা ও অযোগ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু چے سود چوں دل دانا وچشم بینا نیست ---অনুভূতিশীল অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি ফায়দা।

কোরআন হাকীম এক দিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে---যাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে, জুলুম ও অনাচারে জর্জরিত দুনিয়া সুখ-শান্তির আধারে পরিণত হবে। আখিরাতে বেহেশ্ত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতী সুখের নমুনা উপভোগ করা যাবে। ইরশাদ হয়েছে ঃ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সম্মুখে জবাবদিহির জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে ভয় রাখে, তার জন্য দু'টি বেহেশ্ত রয়েছে)।

এ আয়াতের এক ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্-ভীরু ব্যক্তিরা দু'টি জান্নাত লাভ করবে। তন্মধ্যে একটি পরকালে, অপরটি ইহজীবনেই নগদ দেখতে পাবে। এটা কোন কল্ট-কল্পিত ধারণা বা কথার কথা নয়, বরং এ পয়গাম বহনকারী মহান রসূল (সা) একে বাস্তবায়িত করেও দেখিয়েছেন। পরবর্তী খোলাফায়ে-রাশেদীন এবং সুন্নতের অনুসারী অন্যান্য মুসলিম সুলতানের আমলেও 'বাঘে-বকরীতে এক ঘাটে পানি পান করা'র প্রবাদটি একটি বাস্তব সত্যরূপে পরিলক্ষিত হয়েছে। আমীর-গরীব, বাদশাহ-ফকীর ও শ্রমিক-মালিকের বৈষম্য সম্পূর্ণ মিটে গেছে। তখন আঁধার রাতে নিজ গৃহের নির্জন কামরার ভেতরেও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাকে প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব মনে করতেন। এটা কোন অলীক কাহিনী নয়, বরং ঐতিহাসিক সত্য, যার সত্যতা বিধর্মীরাও অকপটে স্বীকার করেছে এবং উদার, নিরপেক্ষ ও বিবেকসম্পন্ন যে কোন অমুসলমানও তা স্বীকার করতে বাধ্য।

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু জানার পর বিস্তারিত তফসীর পাঠ করুন।

আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ —قسط শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও নিষ্ঠা অর্থাৎ প্রত্যেককে তার যোগ্য মর্যাদা ও পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। আল্লাহ্র হক ও সর্বপ্রকার মানবীয় অধিকারই এর আওতাভুক্ত। অতএব, ন্যায়নিষ্ঠার অর্থ কারো প্রতি অবিচার ও অন্যায় আচরণ না করা, অত্যাচারীকে বাধা দান করা, মজলুমের সাহায্য করা, প্রয়োজন হলে তার পক্ষে সাক্ষ্যদানে পশ্চাদপদ না হওয়া, কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি হলেও সাক্ষ্যদান করতে গিয়ে সত্য ঘটনাকে বিকৃত না করা বা চাপা না দেওয়া, ক্ষমতাসীন প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে কোন মোকদ্দমা দায়ের হলে ফরিয়াদী ও আসামী পক্ষকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা, কোন দিকে পক্ষপাতিত্ব না করা, সাক্ষীদের জবানবন্দী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, সত্য উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালানো এবং পরিশেষে পূর্ণ ইনসাফের সাথে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা ইত্যাদি সবই 'কিসত'-এর আওতাভুক্ত।

ন্যায়নীতির পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ সূরা নিসা ও মায়েদার আয়াতদ্বয় যদিও ভিন্ন ভিন্ন সূরার অংশ, কিন্তু উভয়ের বিষয়বস্তু প্রায় অভিন্ন। ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধানত দু'টি কারণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রথমত কারো সাথে বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক যার ফলে সাক্ষীর অন্তরে একথা উদয় হয় যে, তাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দান করা বাঞ্ছনীয়, যাতে তাদের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, বরং তারা যেন উপকৃত হয়। জজ বা বিচারকদের অন্তরে এরূপ ভাবের উদয় হয় যে, তাঁদের সপক্ষেই রায় দান করা উচিত। দ্বিতীয়ত, কারো সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যা সাক্ষী ও জজকে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য ও রায় দানে প্ররোচিত করে থাকে। মোট কথা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা মানুষকে ন্যায়-নীতির পথ থেকে বিচ্যুত করে অন্যায়-অবিচারের পথে পরিচালিত করতে পারে। সূরা নিসা ও মায়েদার আয়াতদ্বয়ে এ দুটি প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সূরা নিসার আয়াতে ভালবাসা ও আত্মীয়তাজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ নিজেদের পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়দের

ক্ষতি হলেও সেদিকে লক্ষ্য না করে সত্য সাক্ষ্য দান করো। সূরা মায়েদার আয়াতে বিদ্বেষ ও শত্রুতাজনিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ইরশাদ হয়েছে ঃ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى অর্থাৎ "কোন গোষ্ঠী বিশেষের প্রতি শত্রুতার কারণে তোমরা ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিও না, বরং ন্যায়নিষ্ঠ হও।" শত্রুতাবশত কারো বিপক্ষে সাক্ষ্য বা রায় দান করা অনুচিত।

উভয় আয়াতের বর্ণনার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সূরা নিসার আয়াতে ইরশাদ হয়েছে قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ আর সূরা মায়েদার আয়াতে قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রথম আয়াতে দু'টি কথা বলা হয়েছে। (প্রথম) কিয়াম, বিল কিস্ত। (দ্বিতীয়) শাহাদাত, লিল্লাহ্। অন্য আয়াতেও এ দু'টি কথাই বলা হয়েছে। তবে শিরোনাম পরিবর্তন করে 'কিয়াম-লিল্লাহ্' ও 'শাহাদাত-বিল কিস্ত' বলা হয়েছে।

অধিকাংশ মুফাস্সিরে-কিরামের মতে এভাবে শিরোনাম পরিবর্তিত হলেও ভাবার্থ একই রয়েছে। তবে এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ শুধু اقسطوا শব্দ দ্বারাও দেওয়া যেত, কিন্তু তার পরিবর্তে كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ অন্যত্র كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঘটনাক্রমে দু'চারটি ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি বজায় রাখলেই দায়িত্ব শেষ হবে না। কেননা, যে-কোন স্বার্থপর নিষ্ঠুর ব্যক্তিও ক্ষেত্র বিশেষে ইনসাফ করে থাকে। কাজেই এটা একান্তই সাধারণ ব্যাপার, বরং এক্ষেত্রে قوامين শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সর্বাবস্থায়, সব সময় শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে ন্যায়নীতির উপর কায়েম থাকবে।

এ আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার যে অপূর্ব মূলনীতি অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, তা কোরআনে আজীমের একক বৈশিষ্ট্য। একে তো কোরআন পাকে শাসক ও শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম এবং শেষ বিচারের ভীতি প্রদর্শন করে সবাইকে এরই জন্য তৈরী করা হয়েছে যে, জনগণ নিজেরাও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং যারা আইনের সমালোচনার দায়িত্বে নিয়োজিত কিংবা আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, তারাও আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের

ভয় অন্তরে রেখে মানুষের সেবা ও কল্যাণের চেষ্টা করবে, আইনকে বিশ্বশান্তি ও মানুষের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যম বানাবে। মানুষের হয়রানি বৃদ্ধি করে কিংবা আদালতী চক্করে ফেলে মজলুমদের প্রতি জুলুমের মাত্রা বৃদ্ধির কারণ সৃষ্টি করবে না। নিজেদের হীন স্বার্থে বা অর্থের বিনিময়ে আইনকে বিক্রি করবে না, বরং নিঃস্বার্থতা ও আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সাধ্যানুযায়ী ন্যায়নীতি অবলম্বন করবে।

দ্বিতীয়ত, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মুসলমান তথা সব মানুষেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। সূরা নিসা ও মায়েদার আয়াতে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে সমগ্র মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা হাদীদে لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ বলে ইনসাফ কায়েম করার দায়িত্ব সমগ্র মানব জাতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সূরা নিসার আয়াতে وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, শুধু অন্যের কাছেই যেন ইনসাফের দাবী করা না হয়, বরং নিজের থেকেও ইনসাফ আদায় করতে হবে। নিজের স্বার্থের পরিপন্থী কোন বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হলে কখনো সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী কোন কথা বলবে না, যদিও তার ক্ষতিটা নিজেকেই ভোগ করতে হয়। কারণ পার্থিব ক্ষতি নগণ্য ও সাময়িক। পক্ষান্তরে এখানে মিথ্যা ভাষণ দিয়ে স্বার্থোদ্ধার করা হলে তার বিনিময়ে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

(১৩৬) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশ্তাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে। (১৩৭) যারা একবার মুসলমান হয়ে পড়ে পুনরায় কাফির হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং

আবারো কাফির হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পথ দেখাবেন।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে ইসলামী অনুশাসনের কতিপয় শাখা-প্রশাখার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ঈমান ও কুফর সম্পর্কেও পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা শুরু করে সূরার প্রায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছান হয়েছে। প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ঈমান সম্পর্কে। অতঃপর কাফিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, (অর্থাৎ যারা মোটামুটিভাবে ঈমান এনে মু'মিনদের দলভুক্ত হয়েছ) তোমরা (আবশ্যকীয় আকায়েদ ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা শোন -) আল্লাহ্ তা'আলার (সত্তা ও গুণাবলীর) প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর (রিসালতের) প্রতি এবং সে কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনের) প্রতি, যা তিনি স্বীয় রসূল (হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর প্রতি নাযিল করেছেন এবং ঐসব কিতাবের (সত্যতার) প্রতি যা তিনি [রসূল (সা)-এর পূর্ববর্তী (রসূল)-দের উপর নাযিল করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে অন্যান্য নবী, ফেরেশ্তা ও কিয়ামতের দিনের উপর ঈমানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।] আর যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা বা গুণাবলীকে অস্বীকার করে এবং অনুরূপভাবে যে আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশ্তাদের (স্বীকার করে না) আর (যে) তাঁর রসূলদের [যাঁদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও রয়েছেন] অবিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে বিশ্বাস করে না, নিশ্চয় সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে পতিত হয়েছে। নিশ্চয় যারা (প্রথমে একবার) ঈমান এনেছে, (কিন্তু ঈমানের উপর স্থির থাকেনি, বরং) আবার কাফির হয়েছে, পুনরায় ঈমান এনেছে (কিন্তু) এবারও ঈমানের উপর অটল থাকেনি (তাহলে তাদের প্রথমবারে মুর্তাদ হওয়ার অপরাধ ক্ষমা করা হত।) বরং তারা আবার কাফির হয়েছে। অতঃপর আর ঈমান আনেনি। (যদি পুনরায় ঈমান আনত, তবে আবার তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হত।) এবং তারা কুফরীর দিকেই অগ্রসর হয়েছে (অর্থাৎ অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কুফরীর উপরই স্থির ছিল)। আল্লাহ্ তা'আলা এহেন লোকদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে চির আকাঙ্ক্ষিত বেহেশ্তের পথও দেখাবেন না (কেননা, ক্ষমা ও বেহেশ্ত লাভ করার জন্য অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মু'মিন থাকা শর্ত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا কারো মতে অত্র আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অনেকের মতে আয়াতটিতে ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, প্রথমে তারা হযরত মূসা (আ)-র প্রতি ঈমান এনেছিল, তারপর গো-বৎসের

পূজা করে কাফির হয়েছিল, অতঃপর তওবা করে আবার ঈমান এনেছিল, পুনরায় হযরত ঈসা (আ)-কে অস্বীকার করে কুফরীর চরমে উপনীত হয়েছে।---(তফসীরে রূহুল মা'আনী)

لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا - এ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, বারবার কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাফির বা মুর্তাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে পূর্ববর্তী সমুদয় গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বারবার কুফরী করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আইন উন্মুক্ত রয়েছে।

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ
اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ
الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ
اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى
يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۚ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ
الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَۨا ۝ الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ
فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ
نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ فَاللّٰهُ
يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
سَبِيْلًا ۝

(১৩৮) সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব—(১৩৯) যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদের নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহ্রই জন্য। (১৪০) আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি

জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ দোযখের মাঝে মুনাফিক ও কাফিরদের একই জায়গায় সমবেত করবেন। (১৪১) এরা এমনি মুনাফিক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীক্ষায় ওঁত পেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফিরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন মীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ্ কাফিরদের মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, নিশ্চয় তাদের জন্য (পরকালে) অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত ও প্রস্তুত) রয়েছে। (তারা অন্তরের আকীদা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে তো ঈমানদারদের মত ছিলই না, অধিকন্তু বাহ্যিক চাল-চলনও মুসলমানদের ন্যায় বজায় রাখতে পারেনি। তাই) মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা ওদের কাছে (গিয়ে) কি সম্মান লাভ করতে চায়? তবে (তাদের জানা উচিত যে,) নিশ্চয় সম্মান তো সম্পূর্ণ আল্লাহ্র (ইখ্তিয়ারভুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যদি ওদেরকে এবং তারা যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদেরকে সম্মান দান না করেন, তবে তারা কিভাবে সম্মান লাভ করবে? হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুনাফিকদের মত কাফিরদের সাথে কোন অবস্থাতেই, বিশেষ করে, তারা যখন কুফরী কথাবার্তা বলে তখন বন্ধুত্ব করো না। যেমন,) কোরআন পাকের (অত্র মাদানী সূরার পূর্বে মক্কী সূরা আন'আমের) মাধ্যমে (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করেছেন যে, যখন (কোন মজলিসে) আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার ও উপহাস (-মূলক কথাবার্তা ও) আলোচনা শুনতে পাও, তখন তারা অন্য কথায় মগ্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বসো না। (এহেন বিদ্রূপকারী মক্কায় ছিল কাফির ও মুশরিকরা আর মদীনায় প্রকাশ্যে গোপনে ইহুদীরা দুর্বল ও দরিদ্র মুসলমানদের সম্মুখে মুনাফিকরা, অতএব, মক্কায় মুশরিকদের মজলিসে অংশগ্রহণ যেমন নিষিদ্ধ ছিল, তদ্রূপ সর্বত্র ইহুদী ও মুনাফিকদের মজলিসে যোগদান করাও নিষিদ্ধ। কেননা,) এমতাবস্থায় তোমরাও তাদের মত (গোনাহ্গার সাব্যস্ত হবে।) যদিও উভয়ের অপরাধের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে যে, একটি কুফরী, অপরটি ফাসিকী। কাফির ও মুনাফিকদের মজলিসে উপবেশন করা সমভাবে নিষিদ্ধ। কেননা কুফরী কথাবার্তা বলা কুফরী কার্যকলাপে মগ্ন হওয়ারই মূল উৎস। (অর্থাৎ কুফরী ভাবধারার দিক দিয়ে উভয় দল একই সমান। অতএব, কুফরীর শাস্তি ভোগ করা অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার ব্যাপারেও তারা উভয়ে একই বরাবর হবে)। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের

সবাইকে জাহান্নামের (মধ্যে একই স্থানে) একত্র করবেন। (ঐসব মুনাফিক) যারা তোমাদের (উপর বিপদের) প্রতীক্ষায় রয়েছে, (এবং আকাঙ্ক্ষা করছে) অতঃপর আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যদি তোমাদের বিজয় হয়, (তবে তোমাদের কাছে এসে বলে), আমরা কি তোমাদের সাথে (জিহাদে শরীক) ছিলাম না? (কেননা গনীমতের মালে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যিকভাবে শুধু নাম কা ওয়াস্তে তারা মুসলমানদের দলভুক্ত থাকত)। আর যদি কাফিরদের কিছুটা (বিজয়ের) ভাগ্য হত (অর্থাৎ ঘটনাক্রমে তারা যদি জয়লাভ করত) তবে (তাদের কাছে গিয়ে) বলত, আমরা কি তোমাদের উপর জয়যুক্ত হচ্ছিলাম না? (পরে তোমাদেরকে জয়যুক্ত করার মানসে মুসলমানদের সহযোগিতা করা হতে বিরত রয়েছি, এমন কি যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করার কৌশল করেছি)। আর (তোমরা যখন পরাস্ত হচ্ছিলে, তখন) আমরা কি তোমাদের মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করিনি? (কাজেই আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর এবং যা কিছু তোমাদের হস্তগত হয়েছে, তার কিছু অংশ আমাদেরও দান কর। এভাবে দু'দিকেই তারা হাত পেতে থাকে। যা হোক, দুনিয়ায় তারা বাহ্যিক ইসলামের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।) অতঃপর কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ও তাদের মধ্যে (বাস্তব) ফয়সালা দান করবেন এবং (উক্ত ফয়সালার মাধ্যমে) আল্লাহ্ তা'আলা কিছুতেই কাফিরদের মুসলমানদের উপর (আধিপত্যের) পথ দেবেন না। (বরং কাফির ও মুনাফিকরা অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে চির-তরে জাহান্নামী হবে, আর মুসলমানরা সত্যের অনুসারী হিসাবে চিরন্তন বেহেশতে প্রবেশ করবে। এটাই যথার্থ ফয়সালা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে প্রথম আয়াতে মুনাফিকদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। তবে এহেন দুঃসংবাদকে بشارت অর্থাৎ 'সুসংবাদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন সুসংবাদ শোনার জন্য প্রত্যেকেই উদ্‌গ্রীব থাকে। কিন্তু মুনাফিকদের জন্য এ ছাড়া আর কোন সংবাদ নেই, বরং তাদের জন্য সুসংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী।

মান-মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে কামনা করা বাঞ্ছনীয়ঃ দ্বিতীয় আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এ ধরনের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করত একেও অযথা-অবান্তর প্রতি-পন্ন করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا অর্থাৎ "তারা কি ওদের কাছে গিয়ে মর্যাদা লাভ করতে চায়? মর্যাদা তো সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ারাধীন।"

কাফির ও মুশরিকদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং অন্তরঙ্গ মেলা-মেশার প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মান-মর্যাদা, শক্তি-সামর্থ্য, ধনবলে প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, ওদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকার কোন মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে সত্যিকার ইজ্জত ও সম্মান নিহিত, তা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ারভুক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোন ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ্প্রদত্ত। অতএব, মান-মর্যাদা দানকারী মালিককে অসন্তুষ্ট করে তাঁর শত্রুদের থেকে মর্যাদা লাভ করার অপচেষ্টা কত বড় বোকামি !

এ সম্পর্কে কোরআন মজীদের 'সূরায়ে-মুনাফিকুন'-এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ মান-মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য এবং তদীয় রসূলের জন্য এবং ঈমান-দারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফিকরা তা অবগত নয়।

এখানে আল্লাহ তা'আলার সাথে হযরত রসূল (সা) ও মু'মিনদের উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মর্যাদা দান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনগণ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগত, পছন্দ-নীয় ও প্রিয়পাত্র, তাই তিনি তাঁদেরকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফির ও মুশরিক-দের ভাগ্যে সত্যিকার কোন ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করে সম্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। ফারুকে আযম হযরত উমর (রা) বলেছেন ঃ

من اعتز بالعبيد اذله الله -(خصاص)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বান্দাদের (মখলুকের) সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেন।

মুস্তাদরাকে-হাকেম-এর ৮২ পৃষ্ঠায় আছে যে, হযরত উমর (রা) সিরিয়ার প্রশাসক হযরত আবূ উবায়দা (রা)-কে বলেন ঃ

كنتم اقل الناس فكثركم الله بالاسلام - وكنتم اذل الناس فاعزكم الله بالاسلام - مهما تطلبوا العزة بغير الله يذلكم الله -

অর্থাৎ "হে আবূ উবায়দা! তোমরা সংখ্যার দিক দিয়ে নগণ্য ছিলে, ইসলামের দৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। তোমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদাহীন ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের দৌলতে তোমাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন। অতএব, মনে রাখবে---আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে যদি তোমরা সম্মান অর্জন করতে চাও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।"

হযরত আবূ বকর জাস্‌সাস (র) 'আহকামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন—আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফির, মুশরিক, পাপিষ্ঠ ও পথভ্রষ্টদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অন্যায় ও অপরাধ। তবে এই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষেধ করা হয়নি। কেননা সূরা মুনাফিকুনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রসূল (সা) ও মু'মিনদের ইজ্জত দান করেছেন।

এখানে মর্যাদার অর্থ যদি আখিরাতের চিরস্থায়ী মান-মর্যাদা হয়, তবে তা আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁর রসূল (সা) ও মু'মিনদের জন্য সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। কারণ আখিরাতের আরাম-আয়েশ, মান-মর্যাদা কোন কাফির বা মুশরিক কস্মিনকালেও লাভ করবে না। আর যদি এখানে পার্থিব মান-মর্যাদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন সত্যিকার মু'মিন থাকবে, ততদিন সম্মান ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ত থাকবে। অবশ্য তাদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফিলতি বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্য বিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে অসহায় হতমান হলেও পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব লাভ করবে। দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু নজীর রয়েছে। শেষ যুগে হযরত ঈসা (আ) ও ইমাম মাহ্‌দীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ—এই আয়াতে ইতিপূর্বে মক্কা মুকাররমায় অবতীর্ণ সূরা আন্'আমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে, আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাযিল করেছিলাম যে, কাফির ও বদকারের ধারে-কাছেও বসবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কপটাচারী মুনাফিকরা আদেশ লঙ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত ও সম্মানের মালিক-মোখতার মনে করেছে।

সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আন্'আমের যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতদুভয়ের সমন্বিত মর্ম এই যে, যদি কোন প্রভাবে কতিপয় লোক একত্র হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কার্যে লিপ্ত থাকবে ততক্ষণ তাদের মজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্য হারাম। অধিকন্তু সূরায়ে আন্'আমের আয়াতে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ -

অর্থাৎ আর যখন তুমি দেখবে ঐ সব লোককে, যারা আমার আয়াত সম্পর্কে বাদানুবাদ করে, তবে তাদের থেকে দূরে থাক, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর আর জালিমদের সাথে বসবে না।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত সম্পর্কে বাদানুবাদ করার কথা বলা হয়েছে। কোরআন পাকের কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার করা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, অর্থ বিকৃত করা অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে-কিরাম (রা)-এর ব্যাখ্যার পরিপন্থী বা ইজমায়ে-উম্মতের বরখেলাফ, মনগড়া বা কল্পনাপ্রসূত তফসীর বয়ান করাও এরই আওতাভুক্ত। তফসীরে মাযহারী, ২য় জিলদ, ২৬৩ পৃষ্ঠায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

دخل فی هذه الایة کل محدث فی الدین و کل مبتدع الی
یوم القیامة ٥(مظهری، ص ٢٦٣ ج ٢)

অর্থাৎ 'কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনের অপব্যাখ্যাকারী, দীনকে বিকৃতকারী, বিদ'আত প্রবর্তনকারী ও তার সমর্থনকারিগণ এই আয়াতের আওতাভুক্ত।'

মনগড়া তফসীরবিদদের মজলিসে বসা জায়েয নয় ঃ এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা কোরআন পাকের দরস ও তফসীরের মধ্যে সলফে-সালেহীনের (পূর্ববর্তী পুণ্যাত্মাগণের) অনুসরণ করে না, তাঁদের তফসীরের পরিপন্থী নিজেদের মনগড়া ও কল্পনাপ্রসূত ব্যাখ্যা-অপব্যাখ্যা প্রদান করে, তাদের দরস বা তফসীরের মজলিসে বসা কোরআনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে নাজায়েয ও গোনাহ্। বাহ্রে-মুহীত নামক তফসীরে আবূ হাইয়্যান (র) বলেন, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, মুখে যে কথা বলা জায়েয নয়, তা স্বেচ্ছায় কানে শোনাও নাজায়েয এবং গোনাহ্। জনৈক আরবী কবি বলেছেন ঃ

وسمعک صن عن سماع القبیح - کصون اللسان من النطق به -

অর্থাৎ "খারাপ বাক্য শ্রবণ করা থেকে স্বীয় কর্ণকেও নিয়ন্ত্রণ কর, যেমন কুবাক্য উচ্চারণ করা থেকে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।"

সূরায়ে আন্'আমের আয়াতে আরো একটি কথা বলা হয়েছে যে, কোন সময় ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত যদি কোন ব্যক্তি এরূপ অবাঞ্ছিত কোন মজলিসে উপস্থিত হয়, তবে স্মরণ হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ উক্ত মজলিস থেকে সরে যাওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় চরম অন্যায় ও অপরাধ হবে।

সূরায়ে নিসা ও আন্'আমের আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, যতক্ষণ তারা অবাঞ্ছিত আলোচনায় লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে বসাও হারাম। মাস-'আলার আর একটি দিক হল এই যে, যখন তারা উক্ত গর্হিত কথাবার্তা ক্ষান্ত করে অন্য কোন প্রসঙ্গে আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তাদের মজলিসে যোগদান ও অংশগ্রহণ করা জায়েয

আছে কি না? যেহেতু কোরআন করীম এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু প্রকাশ করেনি, তাই এ ব্যাপারে ওলামায়ে-কিরামের মতভেদ রয়েছে।

কারো মতে---আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতকে অবজ্ঞা, অস্বীকার, বিকৃত ও বিদ্রূপ করার কারণেই তাদের কাছে বসতে নিষেধ করা হয়েছিল। যখন তারা গর্হিত কথাবার্তা ক্ষান্ত করে অন্য কোন আলোচনা শুরু করবে, তখন নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। অতএব, তখন তাদের মজলিসে অংশগ্রহণ করা অন্যায় বা গোনাহ্ নয়। আর কারো মতে এহেন পাপাত্মা কাফির, মুশরিক, দুরাচারদের সংসর্গ অন্য সময়ও জায়েয নয়। হযরত হাসান বসরী (র)-ও এই অভিমতই সমর্থন করেছেন এবং এর সপক্ষে সূরা আন্'আমের আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থাৎ "স্মরণ হওয়ার পর আর জালিমদের সাথে বসবে না।" একথা সুস্পষ্ট যে, দুরাচাররা তাদের অবাঞ্ছিত কথাবার্তা সমাপ্ত করার পরও দুরাচারই থেকে যায়। কাজেই স্বেচ্ছায় তাদের সাথে ওঠাবসা সর্বদাই পরিত্যাজ্য।---(জাস্সাস)

তফসীরে মাযহারীতে উভয় আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলা হয়েছে যে, যখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতের বিকৃতি, বিদ্রূপ বা অবজ্ঞামূলক কথাবার্তা বন্ধ করে অন্য আলাপে মশগুল হয়, তখন একান্ত প্রয়োজন হলে তাদের কাছে বসা জায়েয কিন্তু একান্ত আবশ্যক ছাড়া তখনও তাদের মজলিসে উপস্থিতি হারাম।

আহ্কামুল-কোরআনে ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (র) লিখেছেন ঃ অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন মজলিসে যখন কোন গোনাহ্র কাজ হতে থাকে, তখন "নাহী আনিল মুনকার" অর্থাৎ অন্যায় কাজে বাধাদান করার বিধান অনুসারে মুসলমানদের কর্তব্য ও দায়িত্ব যে, তা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য থাকলে শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়কে প্রতিহত করবে। যদি সে সামর্থ্য না থাকে, তবে মৌখিক প্রতিবাদ ও বিরাগ প্রকাশ করবে। তাও যদি সম্ভবপর না হয়, তবে অন্তত উক্ত মজলিস বর্জন করবে। কথিত আছে, একদা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মদ্যপানের অপরাধে কতিপয় লোককে গ্রেফতার করেন। তন্মধ্যে একজন সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, সে রোযাদার ছিল এবং মদ্যপান করেনি। তবে মদ্যপানের আসরে বসা ছিল। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) মদ্যপানের আসরে বসে থাকার অপরাধে তাকেও শাস্তি দিয়েছিলেন।---(বাহ্রে-মুহীত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫)

এখানে তফসীরে ইবনে-কাসীরের প্রথম জিলদ ৫৬৭ পৃষ্ঠায় একখানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر - (ابن كثير، ص ٥٦٧ ج ١)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে ব্যক্তি এমন দস্তরখানে বা খানার মজলিসে বসবে না, যেখানে মদ্যপান কিংবা পরিবেশন করা হয়।

ইতিপূর্বে অবাঞ্ছিত লোকদের সাহচর্য পরিত্যাগ ও মজলিস বর্জন করতে বলা হয়েছে যে, মজলিস বর্জন করার ফলে যেন শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্য কোন গোনাহ্ না হয়। যেমন মসজিদে নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়া আবশ্যক। কোন মসজিদে যদি শরীয়তবিরোধী কোন আলোচনা হতে থাকে এবং তার প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করার সামর্থ্য না থাকে, এমতাবস্থায় জামা'আতের সাথে নামায পড়া ত্যাগ করবে না, বরং শুধু অন্তরে তাদের অন্যায় কার্যের প্রতি বিরাগ ও অসন্তোষ পোষণ করাই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে শরীয়তসম্মত প্রয়োজনবশত যদি কোন বৈঠকে উপস্থিত থাকা জরুরী সাব্যস্ত হয় আর সেখানে কতিপয় লোক শরীয়ত বিরোধী মন্তব্য করতে থাকে, তবে অন্যদের অন্যায়কারী ও গোনাহ্গার হওয়ার কারণে উক্ত মজলিস পরিত্যাগ করে নিজে গোনাহ্গার হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও জায়েয নয়। তাই হযরত হাসান বসরী বলেছেন---আমরা অন্যদের গোনাহ্র কারণে যদি নিজেদের কর্তব্য পরিত্যাগ করি, তবে তা প্রকারান্তরে সুন্নত ও শরীয়তকে মিটাবার জন্য ফাসিক-ফাজিল ও বদকার দুরাচারদের জন্য পথ সুগম করার সমর্থক হবে।

মোট কথা, বাতিল পন্থীদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথম, তাদের কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরী। দ্বিতীয়, গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটাও অত্যন্ত অন্যায় ও ফাসিকী। তৃতীয়, পার্থিব প্রয়োজনবশত বিরক্তি সহকারে বসা জায়েয। চতুর্থ, জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার্হ। পঞ্চম, তাদেরকে সৎপথে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া সওয়াবের কাজ।

কুফরীর প্রতি মৌন সম্মতিও কুফরী ঃ আলোচ্য আয়াতের শেষে ইরশাদ হয়েছে ঃ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ- অর্থাৎ এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহর অংশীদার হবে অর্থাৎ আল্লাহ্ না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরী কথাবার্তা মনে-প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বস্তুত তোমরাও কাফির হয়ে যাবে। কেননা কুফরীকে পছন্দ করাও কুফরী। আর যদি তাদের কথাবার্তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে ওঠাবসা কর এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরীয়তকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ! নাউজু বিল্লাহে মিন যালেকা।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى

الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا
قَلِيْلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ﴿١٤٣﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَتُرِيْدُوْنَ
اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

(১৪২) অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্‌র সাথে, অথচ তারা নিজেরাই তাদের প্রতারিত করে। বস্তুত তারা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোকদেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে। (১৪৩) এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুত যাকে আল্লাহ্ গোমরাহ্ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও। (১৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদের বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য দলিল কায়েম করে দেবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা (ঈমানদারী জাহির করে) আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা করে। (যদিও আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতারণা করার অভিপ্রায় তাদের ছিল না, বরং নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তারা এহেন দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেছিল। কিন্তু তাদের আচরণ দৃষ্টে মনে হয় যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে চালবাজি করতে চেয়েছিলো। তাদের দুরভিসন্ধি অন্যের কাছে গোপন থাকলেও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গোপন নয়) এবং তিনিও তাদের এর প্রতিফল দেবেন (অর্থাৎ তাদের প্রতারণামূলক আচরণের সমুচিত প্রতিফল দান করবেন। আর তাদের অন্তর ঈমানশূন্য হওয়ার কারণে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকেও তারা ফরয মনে করে না এবং এজন্য কোন সওয়াবের আশা বা বিশ্বাস করে না। কাজেই) তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। (কারণ বিশ্বাস ও আশা না থাকার কারণে আগ্রহ-উৎসাহ সৃষ্টি হয় না। বরং) মানুষকে (নিজেদের মুসলমানিত্ব ও মুসল্লীয়ানা) দেখায় (যেন তাদেরকে মুসলমান ও মুসল্লী মনে করে) এবং তারা (যেহেতু লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাযের ভান করে, কাজেই নামাযের মধ্যে মৌখিকভাবে) আল্লাহ্‌র যিকির করে না। তবে কিঞ্চিৎ মাত্র (অর্থাৎ তারা শুধু নামাযের মিথ্যা অভিনয় করে থাকে। হয়ত শুধু ওঠা-বসাই করে। কেননা সরবে কিরাত পাঠ করা শুধু ইমামের জন্য তিন ওয়াক্তে প্রয়োজন হয়। ইমামতি করার সৌভাগ্য তাদের হয় না। মোক্তাদী অবস্থায় কোন কিছু না পড়ে শুধু

জিহ্বা নাড়াচাড়া করলে অন্যরা তা কিভাবে জানবে ? এহেন ভাওতাবাজ লোকদের পক্ষে এটাও সম্ভব যে, জিহ্বা নাড়াচাড়া করবে না অথবা দোয়া-কালামের পরিবর্তে অন্য কিছু আওড়াবে। বস্তুত তারা) দোদুল্যমান রয়েছে (মু'মিন ও কাফির) উভয়ের মাঝে। (তারা পুরাপুরি) এদিকেও নয়, ওদিকেও নয়। (কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মু'মিন ব্যক্তি কাফিরদের থেকে ভিন্ন এবং অন্তরের দিক দিয়ে কাফির ব্যক্তি মু'মিনদের থেকে পৃথক। প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেন, (দৃঢ় সংকল্প হওয়ার পর সামর্থ্য দান করার বিধান অনুসারে পথভ্রষ্ট হওয়ার সামর্থ্য দান করেন,) এহেন লোকের (ঈমানদার হওয়ার) জন্য আপনি কোন পথ (খুঁজে) পাবেন না। (অতএব ঐসব কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সুপথে আগমনের আশা পোষণ করবেন না। এখানে মুনাফিকদের নিন্দাবাদ করা হয়েছে এবং মু'মিনদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের অপকর্ম ও দুর্ভাগ্যের জন্য চিন্তিত বা দুঃখিত হওয়ার মত নিষ্ফল কার্যে লিপ্ত হতে চাও ?) হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিনদের বাদ দিয়ে (মুনাফিক বা প্রকাশ্য) কাফিরদের সাথে (অন্তরংগ) বন্ধুত্ব করো না ; (যেমন মুনাফিকদের স্বভাব, তাদের কুফরী ভাবধারা ও বৈরিতা তোমরা অবগত আছো)। তোমরা কি (তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে) নিজেদের বিপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য অভিযোগ (স্পষ্ট দলিল) কায়েম করতে চাও (অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এরূপ বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ) ?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَامُوْا كُسَالٰى—আল্লাহ্র বাণীতে যে শিথিলতার নিন্দা করা হয়েছে তা হচ্ছে বিশ্বাসের শিথিলতা। বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও আমলের মধ্যে যদি কোন শৈথিল্য থাকে, তবে তা অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু তখনও বিনা ওযরে শিথিলতা করা নিন্দনীয়। আর রোগ-কষ্ট, নিদ্রালুতা প্রভৃতি কোন অনিবার্য কারণবশত হলে ক্ষমার্হ।

(বয়ানুল-কোরআন)

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ
نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا
دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۭ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ
اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۭ
وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾

(১৪৫) নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা

তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। (১৪৬) অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ্‌র ফরমাবরদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুত আল্লাহ্ শীঘ্রই ঈমানদারদের মহাপুণ্য দান করবেন। (১৪৭) তোমাদের আযাব দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন যদি তোমরা সত্যের উপর থাক! অথচ আল্লাহ্ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের **সর্বনিম্ন স্তরে** (প্রবেশ করবে।) এবং (হে শ্রোতা) তুমি কিছুতেই তাদের কোন সহায়-সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না (যারা তাদেরকে এহেন শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে)। তবে (তাদের মধ্য হতে) যারা (মুনাফিকী হতে) তওবা করেছে এবং (মুসলমানদের সাথে পীড়াদায়ক আচরণ হতে) আত্মসংশোধন করেছে, (অর্থাৎ পরবর্তীকালে আর কখনো এহেন আচরণ করে নি এবং (কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল, তা পরিত্যাগ করত) আল্লাহ্ তা'আলাকে আঁকড়ে ধরেছে (আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা করেছে) এবং (লোক-দেখানো রিয়াকারী মনোবৃত্তি ত্যাগ করে) দ্বীনকে (অর্থাৎ দ্বীনী আমলসমূহ) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার (সন্তুষ্টি লাভ করার) জন্য করেছে; (অর্থাৎ অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ্‌র তাবেদারী করেছে অর্থাৎ যারা নিজেদের আকীদা বিশ্বাস, বাহ্যিক আচার-আচরণ, আধ্যাত্মিক নীতি, নৈতিকতা ও ধর্মীয় আমল-আখলাক পরিমার্জিত করবে,) ঐসব (তওবাকারী) ব্যক্তিরা (প্রথমাবধি পূর্ণ মু'মিনদের সাথে বেহেশতবাসী) হবে এবং ঈমানদারদের আল্লাহ্ তা'আলা (আখিরাতে) মহান প্রতিদান দান করবেন। (কাজেই যারা মু'মিনদের সাথে থাকবে তারাও মহান প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। আর হে মুনাফিকগণ! আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে তোমাদেরকে যে সব নিয়ামত দান করেছেন) তোমরা যদি (তার) কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর (ঈমান আনয়ন করাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার একমাত্র অনুমোদিত ও পছন্দনীয় পন্থা), তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন? (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কোন কাজ আটকে পড়ে নেই যে, তোমাদেরকে শাস্তি না দিলে তা সমাধা হবে না, বরং তোমাদের কুফরী ও চরম অকৃতজ্ঞতাই তোমাদের শাস্তি ভোগের একমাত্র কারণ। অতএব তোমরা যদি কুফরী পরিত্যাগ করে কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য স্বীকার কর, তাহলে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুধু করুণা ও অনুগ্রহই লাভ করবে)। আল্লাহ্ তা'আলা (তো আনুগত্য স্বীকারকারীদের) গুণগ্রাহী, (এবং তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে) সর্বজ্ঞানী। (কাজেই যে ব্যক্তি আনুগত্য ও আন্তরিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে অবশ্যই তাকে মহান প্রতিদানে ভূষিত করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ—এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার

দরবারে একমাত্র ঐসব আমলই গৃহীত ও কবুল হয়, যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং কোনরূপ রিয়াকারী বা স্বার্থের লেশমাত্র যার মধ্যে নেই। 'মুখলিস' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে-মাযহারীতে লিখিত আছে ঃ الذى يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس عليه মুখলিস সেই ব্যক্তিকে বলে, যে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বপ্রকার আমল করে এবং ঐ কাজের জন্য লোকের প্রশংসা কামনা করে না।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ
ظُلِمَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾ اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا
عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ
وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ
نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ
ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١٥٠﴾ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٥١﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ
مِّنْهُمْ اُولٰۗىِٕكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٥٢﴾

(১৪৮) আল্লাহ্ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ্ শ্রবণকারী বিজ্ঞ। (১৪৯) তোমরা যদি কল্যাণ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, আল্লাহ্ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী। (১৫০) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী, তদুপরি আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। (১৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। (১৫২) আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর, তাঁর রসূলের উপর এবং তাঁদের কারও প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্তুত আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক) খারাপ কথা মুখে আনা পছন্দ করেন না; তবে মজলুম ব্যক্তি (তার উপর কৃত অত্যাচার-অবিচার সম্পর্কে অভিযোগ বর্ণনা করতে পারে)। এবং আল্লাহ্ তা'আলা (মজলুমের) সব কিছু (অভিযোগ) শোনেন (এবং জালিমের জুলুম সম্পর্কে) অবহিত রয়েছেন। (এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জালিমের জুলুম সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেওয়া জায়েয নয়। কারো জোর-জুলুম সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করা জায়েয হলেও) যদি তোমরা কোন উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর অথবা তা গোপন রাখ (অর্থাৎ নীরবে ক্ষমা করে দাও) অথবা (কারো বিশেষ কোন অপরাধ) মার্জনা কর, তবে (তা অতি উত্তম। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলাও অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (যদিও তিনি) সর্বশক্তি-মানও বটেন। (অবাধ্য অপরাধী থেকে তিনি সর্বপ্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি মার্জনা করে থাকেন। অতএব, তোমরাও যদি তদ্রূপ অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দাও, একে ত তোমরা আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হবে; দ্বিতীয়ত এর ফলে আশা করা যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলাও তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন)। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করে (যেমন তাদের আকীদা ও কথাবার্তায় বোঝা যায়।) আর তাঁর রসূলদের যারা অস্বীকার করে, [হযরত ঈসা (আ) বা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এবং অন্য নবীদেরও অস্বীকার করা হয়]। এবং (তারা ঈমান আনার দিক দিয়ে) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে চায় এবং (এহেন হীন মনোভাব মৌখিকভাবেও প্রকাশ করে) বলে যে, আমরা রসূলদের মধ্যে কাউকে মানি না। (এই আকীদার ফলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে এবং অন্য নবীদেরও অমান্যই করা হয়। কারণ, তাঁরা সবাই সব নবীর নবুয়তের সততার সাক্ষ্য দান করেছেন। অতএব, যখন কোন একজন নবীকে অস্বীকার করেছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর সমস্ত নবীরও অবিশ্বাস করা হয়েছে, যা স্পষ্টত ঈমানের পরিপন্থী)। আর তারা এর মাঝামাঝি পথ আবিষ্কার করতে চায়। (অর্থাৎ মুসলমানদের ন্যায় সব পয়গম্বরের প্রতি ঈমানও আনবে না এবং কাফিরদের মত সবাইকে অস্বীকারও করবে না। যা হোক) এরাও সত্যিকার কাফির সন্দেহ নেই। (কেননা, ঈমান ও কুফরীর মাঝে কোন স্তর নেই, বরং আংশিক কুফরও কুফরী। পুরোপুরি ঈমান না আনা পর্যন্ত কুফরী হবে। এবং কাফিরদের জন্য আমি লাঞ্ছনাকর আযাব প্রস্তুত রেখেছি। (এরাও তাই ভোগ করবে) আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সত্যিকার ঈমান এনেছে এবং তাঁর রসূলদের প্রতিও (ঈমান রাখে) এবং (ঈমান আনার দিক দিয়ে) তাদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অচিরেই তাদেরকে প্রতিদান প্রদান করবেন। এবং (যেহেতু) আল্লাহ্ পাক অতি ক্ষমাপরায়ণ, (সুতরাং পূর্ণ ঈমান আনয়নের পূর্বে যত অন্যায় হয়েছে সব ক্ষমা করে দেবেন) আর (যেহেতু তিনি) অতি মেহেরবান। কাজেই ঈমান আনয়নের কারণে তাদের পরবর্তী সৎকার্যসমূহের কয়েক গুণ বেশী সওয়াব দান করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে দুনিয়া হতে জোর-জুলুমের

অবসান ঘটানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা মানব রচিত শাসকসুলভ আইনের মত নয়, বরং ভীতি প্রদর্শন ও আশ্বাস দানের মাধ্যমে এক অপূর্ব কানুন পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মজলুমকে অধিকার দেওয়া হয়েছে, যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে, তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে। অপরদিকে সূরায়ে নহ্ল-এর আয়াতে একটি শর্ত আরোপ করে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ - وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ -

অর্থাৎ আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার। তবে শর্ত হলো এই যে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমরা আবার জুলুম ও বাড়াবাড়ি করো না, বরং ইনসাফের গণ্ডীর মধ্যে থাকবে, অন্যথায় তোমরাও অত্যাচারী ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে। সাথে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম।

এ আয়াতে করীমার দ্বারা আরো বোঝা যায় যে, মজলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগের ফরিয়াদ জানায় তবে তা শেকায়েত ও হারাম গীবতের আওতায় পড়বে না। কারণ জালিম নিজেই মজলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ দিয়েছে ও বাধ্য করেছে।

সারকথা, কোরআন পাক একদিকে মজলুমকে তার প্রতি জুলুমের সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা, ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য পরকালের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَإِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا -

অর্থাৎ 'যদি তোমরা কোন উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর বা তা গোপনে কর অথবা কারো কোন অন্যায়কে ক্ষমা করে দাও, তবে তা অতি উত্তম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমতাবান।'

এই আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেওয়া।

প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট সৎকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও করুণার যোগ্য হবে।

আয়াতের শেষে فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন, যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি তিনি অতি ক্ষমাশীল। আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষমা ও মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

এ হচ্ছে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সংস্কার সাধনের ইসলামী মূলনীতি এবং অভিভাবকসুলভ সিদ্ধান্ত। এক দিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমুন্নত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্ষমা ও মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কোরআন করীমের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ -

অর্থাৎ তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দুশমনী ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।

আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে, যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কোরআন করীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

এখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে কোরআন পাক স্পষ্ট ফয়সালা দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে মান্য করে কিন্তু তাঁর রসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না অথবা কোন পয়গম্বরকে মান্য করে, আর কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে সে ঈমানদার নয়, প্রকাশ্য কাফির, পরকালে তার পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নেই।

একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই ঃ কোরআন হাকীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা ঐ সব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গোঁজামিলকেও ফাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজাতির পাদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্য ধর্মানুসারীদেরকে বোঝাতে চায় যে, 'মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র মুক্তিসনদ নয়, বরং ইহুদী ও খৃস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্মে-

কর্মে স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রসূলকে অথবা অন্তত কোন কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে, যার ফলে তাদের কাফির ও জাহান্নামী হওয়ার কথা এই আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহানুভূতি, উদারতা ও ইহসান বা হিত কামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজীরবিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহানুভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে, যা আমরা যে কোন ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও পরমত সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অবারিত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কুপ্রথার প্রতি পূর্ণ ঘৃণা প্রকাশ করে, ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দু'টি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সযত্নে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে চলবে না, সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। এ কথা কোরআন ও হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন পাক ও ইসলামের অভিমত যদি এই হতো যে, যে কোন ধর্মমতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। হযরত রসূলে করীম (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জিহাদ পরিচালনা করা এমন কি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত ও কোরআন নাযিল করা নিরর্থক হতো। —(নাউযুবিল্লাহে মিন যালেকা)

সূরা বাকারার ৬২ তম আয়াত দ্বারা কেউ কেউ হয়ত সন্দেহে পতিত হতে পারেন, যেখানে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলমান হয়েছে) এবং যারা ইহুদী হয়েছে এবং নাসারা (খৃস্টান) ও সাবেয়ীনদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সৎকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

এই আয়াতে ঈমানদারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার

প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তারা সামান্য পড়াশোনা করে কোরআন উপলব্ধি করতে চায়। তারা এই আয়াত দ্বারা ধারণা করে বসেছে যে, শুধু আল্লাহ্ তা'আলার ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট; নবী-রসূলদের প্রতি ঈমান আনা মুক্তির পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, কোরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান তখনই শুধু গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয়, যখন তার সাথে পয়গম্বর, ফেরেশতা ও আসমানী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়।অন্য-থায় শুধু আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্ববাদ তো স্বয়ং শয়তানও স্বীকার করে। কোরআন করীমের ভাষায় শুনুন ?

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ - فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - بقرة آية ١٣٧

অর্থাৎ তাদের ঈমান ঐ সময় গ্রহণযোগ্য ও তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে, যখন তারা তোমাদের সাধারণ মুসলমানদের মত পুরোপুরি ঈমান আনবে, যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে নবীদের প্রতিও ঈমান আনা অপরিহার্য। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে চিনে রাখো যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। অতএব, আপনার পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট এবং তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন।'

সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত কোন একজন নবীকেও যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, সে প্রকাশ্য কাফির, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব অবধারিত। রসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সত্যিকার ঈমান সাব্যস্ত হয় না।

শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আখিরাতের মুক্তি ও কামিয়াবী শুধু ঐ সব লোকের জন্যই সংরক্ষিত, যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাঁর নবী ও রসূলদের প্রতিও যথার্থ ঈমান ও আস্থা রাখে।

হযরত রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

ان القرآن يفسر بعضه بعضا

অর্থাৎ 'নিশ্চয় কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তফসীর করে।' অতএব, কোরআনী তফসীরের পরিপন্থী কোন তফসীর বর্ণনা করা কারো জন্য জায়েয নয়।

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ

الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ
الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا
فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا
لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾

(১৫৩) আপনার নিকট আহ্‌লে-কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুত এরা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে। বলেছে, একেবারে সামনাসামনিভাবে আমাদের আল্লাহ্‌কে দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন। অতঃপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল ; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মূসাকে প্রকৃষ্ট প্রভাব দান করেছিলাম। (১৫৪) আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় ঢোক। আরো বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালংঘন করো না। এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উল্লেখ করে তার নিন্দা করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহে তাদের আরো কিছু নিন্দনীয় কার্যকলাপের দীর্ঘ তালিকা পেশ করে তজ্জন্য তাদের প্রতি শাস্তি ও আযাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে এই প্রসঙ্গ বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মোহাম্মদ (সা)!] আহলে-কিতাবরা (ইহুদীরা) তাদের প্রতি একখানি (লিপিবদ্ধ) কিতাব আসমান থেকে নামিয়ে আনার জন্য আপনার কাছে দাবী করছে। (যা হোক, তাদের এহেন অসঙ্গত আচরণে আপনি বিস্মিত হবেন না। কারণ) তারা (এমন হঠকারী লোকদের বংশধর, যাদের পূর্বসূরিরা) হযরত মূসা (আ)-র কাছে এর চেয়েও বড় কিছুর আবদার করেছিল এবং বলেছিল, আমাদেরকে আল্লাহ্ দেখাও (পর্দার আড়াল থেকে নয়), প্রকাশ্যভাবে চোখের সামনে ; (তাই তাদের ধৃষ্টতার কারণে) তাদের উপর বজ্রাঘাত হল। (সত্য-মিথ্যা যাচাই করার) বহু নিদর্শন [অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-র মো'জেযাসমূহ] প্রত্যক্ষ করার পরও (আবার) তারা পূজার জন্য গো-বৎস তৈরী করেছিল, এর পরেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম এবং (হযরত) মূসা (আ)-কে প্রকাশ্য প্রভাব

দান করেছিলাম (কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, তারা আমার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার কারণেও কৃতজ্ঞ ও অনুগত হয়নি, আর কোন প্রভাবেও প্রভাবান্বিত হয়নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় ইহুদী দলপতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মূসা (আ)-র প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল, আপনিও তদ্রূপ একখানি লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান হতে নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব। তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের আগ্রহ কিংবা সত্যানুসন্ধিৎসার কারণে এহেন আবদার করেনি। বরং জিদ ও হঠকারিতার কারণে একের পর এক বাহানার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তাদের হঠকারী মনোভাব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওয়াকিফহাল করেন এবং সান্ত্বনা দান করেন যে, এরা এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী রসূলদেরও উত্ত্যক্ত-বিরক্ত করতো, আল্লাহ্-দ্রোহিতামূলক বড় বড় অপরাধও নির্দ্বিধায় করে বসতো। এদের পূর্বসূরিরা হযরত মূসা (আ)-র কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে আল্লাহ্ দেখাতে হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী ইহুদীরা অদ্বিতীয় মাবূদ আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন সত্তা ও একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণাদি অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-র প্রকাশ্য মো'জেযাসমূহ ও ফেরাউনের শোচনীয় সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ্ তা'আলাকে ত্যাগ করে গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এসব অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎখাতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত মূসা (আ)-কে কামিয়াব ও বিজয়ী করেছি। তারা তাওরাতের অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে হয়ত তারা শরীয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের নিচে পিষে মারা হবে। আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন 'ইলইয়া' শহরের দ্বারদেশে উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করবে। আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শনিবার দিন মৎস্য শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব, এগুলো লংঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা একে একে প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছি এবং আখিরাতেও তাদের নিকৃষ্টতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۭ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا

يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ
اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ
الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

(১৫৫) অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকারভঙ্গের জন্য এবং অন্যায়ভাবে রসূলদের হত্যা করার কারণে এবং তাদের এই উক্তির দরুন যে, "আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন।" অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ্ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক। (১৫৬) আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা-অপবাদ আরোপ করার কারণে। (১৫৭) আর তাদের একথা বলার কারণে যে, 'আমরা মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শূলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ। (১৫৯) আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তাদের মৃত্যুর পূর্বে। আর কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের দৌরাত্ম্য এবং তজ্জন্য তাদের নিন্দা ও শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও তাদের কতিপয় অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যথা, হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে তাদের মিথ্যা দাবী ও ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করা বা শূলে চড়ানোর ব্যাপারে তারা যে দাবী করছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। তারা যাকে হত্যা করেছে সে নিহত ব্যক্তি ঈসা (আ) নয় বরং তার সাদৃশ্যপূর্ণ অপর এক ব্যক্তি। বস্তুতপক্ষে তাদের নির্যাতন ও হস্তক্ষেপ হতে উদ্ধার করে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে নিরাপদে আসমানে উত্তোলন করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বস্তুত আমি (তাদের সহিত গর্হিত আচরণের দরুন লা'নত, গজব, লাঞ্ছনা ও বিকৃতি প্রভৃতি) শাস্তিতে নিপতিত করেছি। (অর্থাৎ) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ঐশী বিধি-বিধানের প্রতি (অস্বীকৃতি ও) কুফরীর কারণে এবং (অন্যায় বলে জানা থাকা সত্ত্বেও) নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার দরুন এবং তাদের সে কথার কারণে যে, আমাদের অন্তরাত্মা (এমনই) সংরক্ষিত (যে, তাতে বিপরীত ধর্ম ইসলামের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারে না। আমরা ধর্মের ব্যাপারে একান্তই পরিণত। আল্লাহ্ তা'আলা এর খণ্ডন করেছেন যে, এটা পরিপক্কতা বা সুদৃঢ়তা নয়) বরং তাদের কুফরীর কারণে তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ্ তা'আলা বাঁধন এঁটে দিয়েছেন। (ফলে ন্যায় ও সত্য কথার কোন প্রভাব তাতে হয় না)। কাজেই যৎসামান্য ঈমান ব্যতীত তাদের ঈমান নেই। (আর যৎসামান্য ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই তারা সম্পূর্ণতঃই কাফির)। আর (আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি) তাদের (একটি বিশেষ কুফরীর কারণে এবং তার অর্থ হল হযরত) মরিয়ম (আ)-এর প্রতি গুরুতর অপবাদ আরোপ করার কারণে। (যার ফলে হযরত ঈসা [আ]-কে অবিশ্বাস করা হয়। কারণ, তিনি শিশুকালে মো'জেযার মাধ্যমে নিজের পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন)। এবং (স্পর্ধার সাথে) একথা বলার কারণে (যে) আমরা আল্লাহ্র রাসূল মরিয়ম-পুত্র (ঈসা) মসীহ্কে হত্যা করেছি। (তাদের এ কথাটি নবীদের প্রতি শত্রুতারই প্রমাণ। আর নবীদের সাথে, শত্রুতা পোষণ করা কুফরী ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরন্তু এখানে আল্লাহ্র নবীকে হত্যা করার দাবী করা হয়েছে। নবীকে হত্যা করা এবং কুফরী কার্যের দাবী করাও কুফরী। অথচ কুফরী হওয়া ছাড়াও তাদের এ দাবী মিথ্যা ছিল। কেননা, আসলে) তারা (ইহুদীরা) তাঁকে [হযরত ঈসা (আ)-কে] কতলও করেনি, শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদের জন্য অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এবং (আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে) যারা তাঁর [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)] সম্পর্কে নানা কথা বলে তারা (নিজেরাই) এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত (রয়েছে) তাদের কাছে এ সম্পর্কে (সঠিক) কোন প্রমাণ নেই। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে চলছে এবং ওরা তাকে হত্যা করেনি (একথা) সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজের কাছে (আসমানে) উত্তোলন করেছেন। আর সাদৃশ্য করে দিয়েছেন যাকে ধরে শূলে চড়ানো হয়েছে। (এ কারণেই তাদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে) আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাই স্বীয় অসীম কুদরত ও অপার হিকমতের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ)-কে শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার করে অক্ষত অবস্থায় আসমানে তুলে নেন। এবং অন্য এক ব্যক্তিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেওয়ার ফলে ইহুদীরা আসল ব্যাপার টের করতে পারল না। ঈসা (আ)-র নবুয়তকে অস্বীকার ও তাঁকে হত্যা করার দাবী অচিরে দুনিয়াতেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। কেননা, অত্র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কালে আহলে-কিতাব (অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে এমন) কোন (গোষ্ঠী বা) ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, কিন্তু সে তার মৃত্যুর (কিছু) পূর্বে

[যখন আলমে-বরযখের দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হবে তখন তাঁর অর্থাৎ ঈসা (আ)-র নবুয়তের] প্রতি অবশ্যই ঈমান আনতে বাধ্য হবে। (যদিও তখনকার ঈমান ফলপ্রসূ হবে না। বরং তাতে শুধু তাদের বাতুলতাই প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে এখনই যদি তাঁর নবুয়তের সত্যতা স্বীকার করে নিত, তবে তা কল্যাণকর হতো) আর (ইহজগত ও আলমে বরযখের সমাপ্তির পর) কিয়ামতের দিন তিনি [হযরত ঈসা (আ)] তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আলে-ইমরানের يٰعِيسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ—আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দুশমন ইহুদীদের দুরভিসন্ধি বান্‌চাল করে তাদের কবল থেকে হযরত ঈসা (আ)-কে হেফাযত করা প্রসঙ্গে পাঁচটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আলে-ইমরানের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম ওয়াদা ছিল তাঁকে হত্যা করার কোন সুযোগ ইহুদীদেরকে দেওয়া হবে না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজের কাছে তুলে নেবেন। সূরায়ে নিসার আলোচ্য আয়াতে ইহুদীদের দুষ্কর্মের বর্ণনার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াদা বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে হযরত ঈসা (আ)-র হত্যা সংক্রান্ত ইহুদীদের মিথ্যা দাবীকে খণ্ডন করা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ অর্থাৎ ওরা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যাও করতে পারেনি, শূলেও চড়াতে পারেনি, বরং আসলে ওরা সন্দেহে পতিত হয়েছিল।

সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ? وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামে-তফসীর হযরত যাহ্হাক (র) বলেন—ইহুদীরা যখন হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলো, তখন তাঁর ভক্ত সহচরবৃন্দ এক স্থানে সমবেত হলেন। হযরত ঈসা (আ)-ও সেখানে উপস্থিত হলেন। শয়তান ইবলীস তখন রক্তপিপাসু ইহুদী ঘাতকদের হযরত ঈসা (আ)-র অবস্থানের ঠিকানা জানিয়ে দিল। চার হাজার ইহুদী দুরাচার একযোগে গৃহ অবরোধ করলো। তখন হযরত ঈসা (আ) স্বীয় ভক্ত-অনুচরদের সম্বোধন করে বললেন,---তোমাদের মধ্যে কেউ এই গৃহ থেকে বেরিয়ে আসতে ও নিহত হতে এবং পর-কালে বেহেশতে আমার সাথী হতে প্রস্তুত আছো কি ? জনৈক ভক্ত আত্মোৎসর্গের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। হযরত ঈসা (আ) নিজের জামা ও পাগড়ি তাঁকে পরিধান করালেন। অতঃপর তাঁকে হযরত ঈসা (আ)-র সদৃশ করে দেওয়া হলো। যখন তিনি গৃহ হতে বহির্গত হলেন, তখন ইহুদীরা ঈসা (আ) মনে করে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে গেল এবং শূলে চড়িয়ে হত্যা

করলো। অপরদিকে হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে তুলে নিলেন। —(তফসীরে কুরতুবী)

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহুদীরা 'তায়তালানুস' নামক জনৈক নরাধমকে সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আসমানে তুলে নেওয়ায় সে তাঁর নাগাল পেল না। বরং ইতিমধ্যে তার নিজের চেহারা হযরত ঈসা (আ)-র মত হয়ে গেল। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে যখন গৃহ হতে বেরিয়ে এল তখন অন্য ইহুদীরা তাকেই ঈসা (আ) মনে করে পাকড়াও করলো এবং শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করলো। ---(তফসীরে মাযহারী)

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটিই সত্য হতে পারে। কোরআন করীম এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু ব্যক্ত করেনি। অতএব, প্রকৃত ঘটনার সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অবশ্য কোরআন পাকের আয়াত ও তার তফসীর সংক্রান্ত রিওয়ায়েত সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রকৃত ঘটনা ইহুদী ও খৃস্টানদেরও অজ্ঞাত ছিল। তারা চরম বিভ্রান্তির আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, শুধু অনুমান করে তারা বিভিন্ন উক্তি ও দাবী করছিল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যেই চরম মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ـ

অর্থাৎ 'যারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে, তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন সত্য-নির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।'

কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বললো, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল ঈসা (আ)-র মত হলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপরি এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আ) হয় তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে হযরত ঈসা (আ)-ই বা কোথায় গেলেন?

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু অতি পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী।' ইহুদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে কতল করার যত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর হিফাযতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তখন তাঁর অসীম কুদরত ও অপার হিকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ্

তা'আলা প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজের নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। জড়পূজারী বস্তু-বাদীরা যদি হযরত ঈসা (আ)-কে সশরীরে আসমানে উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

পরিশেষে এ প্রসঙ্গটির উপসংহার টেনে বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ— الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ— অর্থাৎ ইহুদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না এবং হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নবুয়তকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল!

এই আয়াতের مَوْتِهٖ অর্থাৎ 'তার মৃত্যুর পূর্বে' শব্দের একটি ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে তফসীরের সার-সংক্ষেপের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে এখানে ইহুদীদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আয়াতের তফসীর এই যে, প্রত্যেক ইহুদীই তার অন্তিম মুহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আ)-র নবুয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফেরাউনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্বিতীয় তফসীরে যা সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীদের বিপুল জামাত কর্তৃক গৃহীত এবং সহীহ্ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো مَوْتِهٖ 'তার মৃত্যু' শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা (আ)-র মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এই আয়াতের তফসীর হলো ঃ আহলে-কিতাবরা এখন যদিও হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদীরা তো তাঁকে নবী বলে স্বীকারই করতো না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করতো (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেকা)। অপরদিকে খৃস্টানরা যদিও ঈসা মসীহ (আ)-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবীদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদীদের মতই হযরত ঈসা (আ)-র ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আ)-কে স্বয়ং খোদা বা খোদার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কোরআন পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃস্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না, বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনবে। খৃস্টানরা মুসলমানদের মত সহীহ্

আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদীদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া হতে সর্বপ্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা আচার-অনুষ্ঠান উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়েম হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليقتلن الدجال وليقتلنّ الخنزير وليكسرن الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين - ثم قال ابو هريرة رض واقرؤا ان شئتم وان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته -

قال ابو هريرة رض قبل موت عيسى يعيدها ثلاث مرّات - (قرطبى)

অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক রূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দজ্জালকে কতল করবেন, শূকর নিধন করবেন এবং ক্রুশকে চুরমার করবেন। তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা হবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন--তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার, যাতে বলা হয়েছে—'আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এর অর্থ "হযরত ঈসা (আ)-র মৃত্যুর পূর্বে।" এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। —(তফসীরে কুরতুবী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত অত্র তফসীর বিশ্বস্ত সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অত্র আয়াতে কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে হযরত ঈসা (আ)-র পুনরাগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

উপরোক্ত তফসীরের ভিত্তিতে অত্র আয়াত স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে যে, অদ্যাবধি হযরত ঈসা (আ)-র মৃত্যু হয়নি। বরং কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগে তিনি আবার যখন আসমান থেকে সশরীরে অবতরণ করবেন এবং তাঁর অবতরণের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব নিগূঢ় রহস্য জড়িত রয়েছে, তা যখন পূর্ণ হবে এবং তাঁর দায়িত্ব সুসম্পন্ন হবে, তখন এ পৃথিবীর বুকেই তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁর কবরের স্থানও নির্ধারিত রয়েছে।

সূরায়ে 'যুখরুফ'-এর ৬১তম আয়াতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় ঃ وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ অর্থাৎ "হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের একটি

নিদর্শন। অতএব, তোমরা কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে না এবং আমার কথা মান্য কর।" অধিকাংশ তফসীরকারের মতে انه 'নিশ্চয় তিনি' শব্দ দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। অন্য আয়াতে কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে হযরত ঈসা (আ)-র পুনরাগমনের খবর দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর আগমনকেই কিয়ামতের নিদর্শন হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আয়াতের অন্য ক্বেরাআত لَعَلَّمٌ রেওয়ায়েত করা হয়েছে, যার অর্থ আলামত বা লক্ষণ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

عن ابن عباس رضى فى قوله تعالى وانه لعلم للساعة قال خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة - (تفسير ابن كثير)-

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) وانه لعلم للساعة আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-র আবির্ভাব কিয়ামতের অন্যতম আলামত।---(ইবনে কাসীর)

মোদ্দা কথা, উপরোক্ত আয়াতের উভয় ক্বেরাআত অনুসারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস ও তফসীর সমন্বয়ে হযরত ঈসা (আ)-র অদ্যাবধি জীবিত থাকা, কিয়ামতের পূর্বে পুনরাগমন ও ইহুদীদের উপর পূর্ণ বিজয়ী হওয়া প্রতীয়মান হচ্ছে।

ইমামে-তফসীর আল্লামা ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ

وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عادلاً- (ابن كثير)-

অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) হতে মোতাওয়াতের রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, তিনি কিয়ামতের পূর্ববর্তী যুগে ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে হযরত ঈসা আ)-র আগমনের সংবাদ দিয়েছেন।

এ ধরনের মোতাওয়াতের রেওয়ায়েতসমূহ আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র) একত্র করেছেন। এ অধম সেটি আরবী ভাষায় সংকলন করেছে। তিনি তার নামকরণ করেছেন ঃ التصريح بما تواتر فى نزول المسيح 'আত-তাসরীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযূলিল মসীহ', যা তৎকালেই

মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি হলব শহরের জনৈক প্রখ্যাত আলিম আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ বর্ধিত ব্যাখ্যা ও টিকাসহ উহা বৈরুত থেকে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

হযরত ঈসা (আ)-র পুনরাগমনের আকীদা অপরিহার্য, ইহা অস্বীকারকারী কাফির ঃ আলোচ্য আয়াত এ বিষয়ে একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। তা ছাড়া সূরা আলে-ইমরানের তফসীরেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান যুগের কোন কোন নাস্তিক যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করে, তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ
وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴿١٦٠﴾ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا
عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

(১৬০) বস্তুত ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল—তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহ্‌র পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন। (১৬১) আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুত আমি কাফিরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ইহুদীদের অপকীর্তি ও তজ্জন্য তাদের প্রতি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতসমূহেও তাদের কতিপয় অপকর্মের বর্ণনা এবং অন্য এক ধরনের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো আখিরাতে তো তাদের নির্ধারিত শাস্তি হবেই। তদুপরি তাদের গোমরাহীর কারণে ইহজগতেই অনেক পবিত্র বস্তু যা ইতিপূর্বে হালাল ছিল, শাস্তিস্বরূপ তাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সুতরাং (ইতিপূর্বে সূরায়ে বাকারায় বর্ণিত) ইহুদীদের মারাত্মক অপরাধসমূহের কারণে আমি (অনেক হালাল সুস্বাদু উপাদেয়) পবিত্র দ্রব্য যা (পূর্বে) তাদের জন্য হালাল ছিল, [যেমন সূরায়ে আলে-ইমরানে كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ —অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য সর্বপ্রকার খাদ্য হালাল ছিল—আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। মূসা (আ)-র শরীয়তে] তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছি। (সূরা আন'আমের وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ আয়াতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, তাদের গোনাহ্ ও অবাধ্যতার কারণেই এসব পবিত্র হালাল দ্রব্যকে তাদের

জন্য হারাম করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতার কারণেই তাদেরকে এরূপ সাজা দিয়েছি) এবং হযরত মূসা (আ)-র শরীয়তে সব সময়ই সেগুলো হারাম ছিল (তন্মধ্যে একটিও হালাল হয়নি)। এ কারণে যে (পরবর্তীকালেও তারা অপরাধমূলক তৎপরতা থেকে বিরত হয়নি। বরং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলীকে গোপন বা বিকৃত করে) তারা বহু লোককে আল্লাহ্র পথে (অর্থাৎ সত্য দীন গ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো। কেননা আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করা ও সন্দেহের অবসান করা যদিও অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তাদের বিভ্রান্তিকর উক্তি ও আচরণের ফলে বহু লোক বিপথগামী হয়ে সত্য দীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে।) আর তাদের সুদ গ্রহণ করার কারণে, অথচ (তওরাতে) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছিল এবং (এ কারণে যে,) তারা (শরীয়তসম্মত বিধান লংঘন করে সম্পূর্ণ) অবৈধভাবে লোকের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করতো।

(মোট কথা, দীনের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা, সুদ গ্রহণ করা, অবৈধভাবে অপরের মাল কুক্ষিগত করা প্রভৃতি অপরাধমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখার কারণে হযরত মূসা (আ)-র শরীয়তে শেষ অবধি কোনরূপ সহজীকরণ করা হয়নি তবে হযরত ঈসা (আ)-র নতুন শরীয়তে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। যেমন কোরআনের আয়াতে وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ 'আর তোমাদের প্রতি যা হারাম করা হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু হালাল করার জন্য' আয়াত দ্বারা বোঝা যায়। ইসলামী শরীয়তে আরো সহজ করে বলা হয়েছে يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ অর্থাৎ 'মুসলমানদের জন্য সব পবিত্র দ্রব্য হালাল।' যা হোক, এতক্ষণ গেল ইহুদীদের প্রতি একটি বিশেষ পার্থিব শাস্তির কথা। আর (আখিরাতে) আমি তন্মধ্যে যারা কাফির (অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে) তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। (অবশ্য) যারা পুরোপুরি যথাবিধি ঈমান আনয়ন করবে, তাদের পূর্ববর্তী সমুদয় অন্যায় অপরাধ মার্জনা করা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামী শরীয়তেও কোন কোন দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের জন্য কোন দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল।

لٰكِنِ الرّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ
وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٢﴾

(১৬২) কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ঈমানদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা নামাযে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুত এমন লোকদেরকে আমি দান করবো মহাপুণ্য।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ঐসব ইহুদীর উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কুফরী আকীদার উপর অনড় ছিল এবং বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত ছিল। এখন ঐসব মহান ব্যক্তির প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে, যারা আহ্লে-কিতাব ছিলেন সত্য কিন্তু যখন নবীয়ে আখেরী যামান (সা)-এর আবির্ভাব হয়, তখন তাঁর সম্পর্কে তাদের কিতাব (লিখিত) নিদর্শন ও লক্ষণাদি দেখে ঈমান এনেছিলেন। যেমন----হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ঐ সব লক্ষণ পুরোপুরি পরিদৃষ্ট হলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, হযরত উসাইদ, হযরত সা'লাবা (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন। এই আয়াতে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কিন্তু তাদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) মধ্যে যারা (ধর্মীয়) জ্ঞানে পরিপক্ক (অর্থাৎ তদনুযায়ী কাজ করতে কৃতসংকল্প এবং এ সংকল্পই তাদের সম্মুখে সত্যকে উদ্ভাসিত করেছে, দ্বিধাহীন চিত্তে সত্যকে গ্রহণ করার শক্তি যুগিয়েছে। যার বিবরণ পরে দেওয়া হবে। এবং (তাদের মধ্যে যারা) ঈমানদার, তারা ঐ কিতাবও মানে, যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং ঐসব কিতাবের প্রতিও (ঈমান এনেছে,) যা আপনার পূর্বে (অন্য রসূলদের প্রতি) অবতীর্ণ হয়েছে এবং (তাদের মধ্যে) যারা (সুষ্ঠুভাবে) নামায কায়েম রাখে এবং (যারা) যাকাত প্রদান করে আর (যারা) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাদেরকে আমি (পরকালে) উত্তম প্রতিফল দান করব সন্দেহ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তা তাঁদের ঈমান ও সৎকর্মের কারণে। অন্যথায় শুধু জরুরী আকীদা-বিশ্বাসকে সংশোধনের উপরই আখিরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে।

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۢ بَعْدِهٖ ۚ وَ
أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسٰى
وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾
وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ

عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ
لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ
عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾ لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾
اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾

(১৬৩) আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সেসব নবী-রসূলের প্রতি, যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানদের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। (১৬৪) এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাঁদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি। আর আল্লাহ্ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। (১৬৫) সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রসূলদের প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলদের পরে আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ। (১৬৬) আল্লাহ্ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তিনি যে তা স্বজ্ঞানেই করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেও সাক্ষী। এবং ফেরেশতারাও সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (১৬৭) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহ্র পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে। (১৬৮) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ্ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। (১৬৯) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

যোগসূত্র ঃ يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ—এ আয়াতে ইহুদীদের একটি নির্বোধ প্রশ্নের উল্লেখ করে সবিস্তারে তার জবাব দেওয়া হয়েছে। এখানে উক্ত প্রশ্নটির অন্যভাবে জবাব দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য আসমান থেকে লিপিবদ্ধ কিতাব নিয়ে আসার শর্ত আরোপ করছ। কোরআন পাকে পূর্ববর্তী যেসব

নবী-রসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তোমরাও তাঁদেরকে মান্য কর। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে তোমরা এ ধরনের আবদার উত্থাপন কর না কেন? শুধু অলৌকিক ঘটনাবলীর কারণে যদি তাঁদেরকে মানতে পার, তবে মুহাম্মদ (সা)-কেও মানতে হবে। কেননা, তাঁর থেকেও বহু মো'জেযা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আসল কথা হলো---তাদের এ আবদার সত্যকে জানার জন্য ছিল না, বরং বিদ্বেষপ্রসূত ছিল।

অতঃপর পয়গম্বর প্রেরণের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং হযরত (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি আপনার সত্যতা স্বীকার না করে, তবে তাদেরই পরিণতি শোচনীয় হবে; আপনার কোন ক্ষতি হবে না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতারা আপনার নবুয়তের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আপনাকেই (নবীরূপে নতুন পাঠাইনি। বরং) আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি। যেমন (ইতিপূর্বে) ওহী পাঠিয়েছিলাম (হযরত) নূহ (আ)-র প্রতি এবং তাঁর পরবর্তী (অন্যান্য) নবীদের প্রতি; এবং (তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম জানিয়ে দিচ্ছি যে,) আমি (হযরত) ইবরাহীম (আ) ও (হযরত) ইসমাঈল (আ) ও (হযরত) ইসহাক (আ) ও (হযরত) ইয়াকুব (আ) ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে যত নবী অতীত হয়েছেন, (হযরত) ঈসা (আ) ও (হযরত) আইউব (আ) ও ইউনুস (আ) ও (হযরত) হারুন (আ) ও (হযরত) সুলায়মান (আ)-এর প্রতি এবং (অনুরূপভাবে) আমি (ওহী নাযিল করেছিলাম হযরত) দাউদ (আ)-এর প্রতি (এবং) তাঁকে যবুর (কিতাব) দান করেছিলাম এবং (এতদ্ব্যতীত) আরো অনেক পয়গম্বরকেও (ওহীর অধিকারী করেছি) যাঁদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে (সূরায়ে আন'আম ও অন্যান্য মক্কী সূরায়) আপনাকে শুনিয়েছি। আর এমন সব পয়গম্বরের প্রতি (ওহী নাযিল করেছি) যাঁদের বৃত্তান্ত (এখন পর্যন্ত) আপনার কাছে বলিনি এবং (হযরত) মুসা (আ)-র (প্রতিও) আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করেছেন। এবং (তাঁর) সাথে বিশেষভাবে কথোপকথন করেছেন। (তাঁরা) সবাই পয়গম্বর (রূপে প্রেরিত হয়েছেন। ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য তাঁরা পরকালে পরিত্রাণ ও বেহেশত লাভের) সুসংবাদদাতা এবং (অবাধ্য কাফিরদেরকে জাহান্নামের কঠিন আযাবের) ভীতি-প্রদর্শনকারী রূপে। যেন মানুষের জন্য (কোন অজুহাত বা) আল্লাহ্র উপর কোন অভিযোগ (অবশিষ্ট) না থাকে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যেন একথা বলতে না পারে যে, অনেক কাজের ভাল-মন্দ আমরা বিবেক দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি নি, তাই ভুল করেছি। সঠিক জানতে পারলে শুধু ভাল কাজই করতাম, অতএব আমরা নিরপরাধ। আর আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল প্রতাপশালী সর্বশক্তিমান, পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি নবীদের প্রেরণ না করেও যদি শাস্তি দান করতেন, তবে তা অবিচার বা জুলুম হতো না। কেননা তিনিই সবকিছুর সার্বভৌম মালিক ও স্বত্বাধিকারী। যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে। এতে কারো কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। তবে যেহেতু তিনি অতি প্রজ্ঞাময় (সুবিবেচক, তাই স্বীয় সুবিবেচনা অনুসারে নবী ও রসূলদের প্রেরণ করেছেন যেন কারো কোন ওজর-আপত্তি উত্থাপন করার অবকাশ না

থাকে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে নবী প্রেরণের নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে নবুয়তে-মুহাম্মদী [সা] প্রমাণ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে যে, ওদের সন্দেহ ভঞ্জনের পরেও যদি ওরা ঈমান না আনে, তবে আপনি বিস্মিত ও চিন্তিত হবেন না। কারণ, বাস্তবে আপনার নবুয়ত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, এবং আপনার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ চিরভাস্বর রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্যদান করছেন কিতাবের মাধ্যমে, যা তিনি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করছেন এবং অবতীর্ণ করেছেন স্বীয় পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাথে। (ফলে এ মহান কিতাব আল-কোরআনই এক চিরস্থায়ী মো'জেযা স্বরূপ আপনার নবুয়তের সত্যতার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এহেন বিস্ময়কর কিতাবের মাধ্যমে আপনার নবুয়তের সাক্ষ্যদান করছেন। অর্থাৎ অকাট্য দলীল এবং অনস্বীকার্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি পবিত্র কোরআনকে নজীরবিহীন বিস্ময়কর ভাষায় নাযিল করেছেন। অতএব, দলীল-প্রমাণের দিক দিয়ে রসূলল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়ত প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর নবুয়তকে স্বীকার করা একান্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু হঠকারিতা ও জিদের বা স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অনেকে তাঁর নবুয়তকে স্বীকার করে না। আর তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি) ফেরেশতারা (আপনার নবুওয়তকে স্বীকার করছে। এবং মু'মিন-মুসলমানদের স্বীকৃতি ও আনুগত্য তো সুস্পষ্ট। অতএব, মুষ্টিমেয় কতিপয় আহাম্মকের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতায় আপনার কি ক্ষতি হবে?) আর আসল কথা হলো, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য (অর্থাৎ প্রমাণাদি উপস্থাপনই) যথেষ্ট। আপনি কারো স্বীকৃতি বা সমর্থনের মুখাপেক্ষী নন। এত সব অকাট্য-অনস্বীকার্য প্রমাণাদি সত্ত্বেও যারা (আপনার নবুয়তকে) অস্বীকার করে এবং (আরো বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তারা অন্যদেরও) আল্লাহ্র পথে (চলতে) বাধাদান করে, তারা (সত্য হতে বিচ্যুত হয়ে) বহু দূরে (পতিত হয়েছে। এ হল ইহকালে তাদের ধর্ম-কর্মের অবস্থা। আর আখিরাতে কর্মফল এই যে,) নিশ্চয় যারা (সত্যকে) অস্বীকার করেছে এবং (সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে) অন্যের ক্ষতি সাধন করছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ (অর্থাৎ বেহেশতের পথ তাদেরকে) দেখাবেন না। তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এ শাস্তি অতি সহজ। এজন্য বিশেষ কোন আয়োজন উপকরণের প্রয়োজন হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ

—এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবীদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি আল্লাহ্র খোদায়ী ওহী নাযিল হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ওহী নাযিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী নবীদের যারা মান্য করে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা তাঁকে অস্বীকার করে, তারা যেন অন্য সব নবীকে এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আ) ও তৎপরবর্তী নবীদের ওহীর সাথে তুলনা করার কারণ হয়ত এই যে, হযরত আদম (আ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। হযরত নূহ (আ)-এর যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। হযরত আদম (আ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল প্রাথমিক শিক্ষাস্বরূপ, ক্রমে তা উন্নত হতে থাকে এবং হযরত নূহ (আ)-এর আমলে পূর্ণতা লাভ করে পরীক্ষা গ্রহণের স্তরে পৌঁছেছিল এবং পরীক্ষা শুরু হলো। যারা উত্তীর্ণ হলো, তাদের জন্য পুরস্কার, আর যারা অবাধ্যতা করলো তাদের জন্য আযাবের ব্যবস্থা করা হলো। অতএব, শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সম্বলিত ওহী-প্রাপ্ত নবীগণের আগমন হযরত নূহ (আ) হতেই শুরু হয়েছিল। অপর দিকে ওহী অস্বীকার-কারী বিরুদ্ধাচারীদের উপর সর্বপ্রথম আযাবও হযরত নূহ (আ)-এর কালেই আরম্ভ হয়।

সারকথা এই যে, হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বে আল্লাহ্র ওহীর অবাধ্য ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর কোন ব্যাপক আযাব বা গযব আপতিত হতো না। বরং তাদেরকে মা'জুর সাব্যস্ত করে অব্যাহতি ও অবকাশ দেওয়া হতো, বোঝাবার চেষ্টা করা হতো। হযরত নূহ (আ)-এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার অধিকতর প্রচার-প্রসার হয়েছিল এবং আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে মানুষের কাছে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, তখন থেকেই অবাধ্যদের উপর আল্লাহ্র আযাব নাযিল হতে থাকে। হযরত নূহ (আ)-এর যমানার সর্ব-নাশা মহাপ্লাবনই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক আযাব। পরবর্তীকালে হযরত হূদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত শোয়ায়েব (আ) প্রমুখ পয়গম্বরের আমলেও তাঁদেরকে অমান্যকারী নাফরমান কাফিরদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার আযাব ও গযব আপতিত হয়েছে। অতএব, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আ) ও তৎ পরবর্তীদের ওহীর সাথে তুলনা করে মক্কার মুশরিক ও আহলে-কিতাব ইহুদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত চিরাচরিত নিয়মানুসারে তারা যদি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী অর্থাৎ কোরআনকে অস্বীকার বা অমান্য করে, তবে তারাও ভয়াবহ শাস্তির আওতায় পড়বে।---(ফাওয়ায়েদে ওসমানী)

হযরত নূহ (আ)-এর অস্তিত্বই ছিল এক অনন্য মো'জেযা। তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর দৈহিক শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, একটি দাঁতও পড়েনি, একগাছি চুলও পাকেনি। তিনি সারা জীবন দেশবাসীর নির্যাতন-নিপীড়ন অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছেন। ---(তফসীরে-মাযহারী)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ —"এবং আরো বহু রসূল যাঁদের ইতি-

বৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি।" এ আয়াতে হযরত নূহ (আ)-এর পরে যেসব পয়গম্বর আগমন করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে বলার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, এরা সবাই আল্লাহ্র পয়গম্বর এবং নবীগণের নিকটে বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী পৌঁছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব

আকারে ওহী এসেছে আবার কখনো আল্লাহ্ তা'আলা রসূলের সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন। সারকথা, যে কোন পন্থায় ওহী পৌঁছুক না কেন, তদনুযায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইহুদীদের এরূপ আবদার করা যে তাওরাতের মত লিখিত কিতাব নাযিল হলে আমরা মান্য করবো অন্যথায় নয়—সম্পূর্ণ আহাম্মকী ও স্পষ্ট কুফরী।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন—আল্লাহ্ তা'আলা একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন, যাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী রসূলের সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন। ---(তফসীরে-কুরতুবী)

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ—"পয়গম্বরগণ সুসংবাদ দানকারী এবং ভীতি প্রদর্শনকারী" আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের ঈমান ও সৎকর্মশীলতার পুরস্কার স্বরূপ বেহেশতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং কাফির, বেঈমান ও দুরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নবী প্রেরণ করেছেন যেন কিয়ামতের শেষ বিচারের দিনে অবাধ্য ব্যক্তিরা অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, ইয়া আল্লাহ্! কোন্ কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন্ কাজে বিরাগ হন, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি। জানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনীয় এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিক মো'জেযাসহ নবীদের প্রেরণ করেছেন এবং তাঁরা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দীন ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহ্র ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যার মোকাবিলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কোরআন পাক এমন এক অকাট্য দলীল যার সম্মুখে কোন অপযুক্তি টিকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও তদবীরের ইহা এক কল্পনাতীত নিদর্শন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন---একদা হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে একদল ইহুদী উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমরা সন্দেহাতীতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সত্য রসূল। তারা অস্বীকার করলো। তখনই ওহী নাযিল হল ঃ لكن الله يشهد بما انزل اليك

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ কিতাবের (আল-কোরআনের) মাধ্যমে যা তার পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিদর্শন, আপনার নবুয়তের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি আপনাকে ঐ কিতাবের যোগ্য জেনেই কিতাব নাযিল করেছেন। আর ফেরেশতারাও এর সাক্ষী। অধিকন্তু সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্যদানের পর আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

মহানবী (সা) ও কোরআন পাকের সত্যতা প্রমাণের পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন--- এখনও যারা কোরআন মজীদ ও রসূলে করীম (সা)-কে অস্বীকার করে এবং তাওরাতে রসূল (সা)-এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে তা গোপন করে এবং এক কথায় অন্য কথা লোকের কাছে প্রকাশ করে এবং তাদেরকে সত্য দীন হতে বিরত ও বঞ্চিত করে, এহেন চরম অপরাধীদের কস্মিনকালেও ক্ষমা ও হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হবে না। এতদ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একমাত্র হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়েত সীমাবদ্ধ ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ করা চরম গোমরাহী। অতএব, ইহুদীদের সব ধ্যান-ধারণা, ধর্মকর্ম ভ্রান্ত ও বাতিল।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾

(১৭০) হে মানবকুল! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও, তাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ, আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্র। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ।

যোগসূত্র ঃ ইতিপূর্বে ইহুদীদের একটি অন্যায়-আবদারের জবাব দিয়ে নবুয়তে মুহাম্মদীর সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এবার সমগ্র মানব জাতিকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের প্রতি আস্থা ও ঈমান এবং তাঁর পুরাপুরি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মাধ্যমেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবী লাভ করা সম্ভব, অন্য কোন পন্থায় নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে (সারা বিশ্বের) সমগ্র মানব (জাতি)! তোমাদের কাছে (এ) মহান রসূল (সা) আগমন করেছেন, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে সত্য বাণী (অর্থাৎ সত্য বাণী ও সঠিক দলীল-প্রমাণ) নিয়ে। অতএব, (অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দাবীর চাহিদা মোতাবেক) তোমরা (তাঁর প্রতি এবং তিনি যখন যা বলেন সে সবের প্রতি) দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর। (যারা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছো তারা ঈমানের উপর দৃঢ় থাক, আর যারা এখনও ঈমান আনয়ন করনি তারা সত্বর ঈমান আনয়ন কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। কেননা এভাবেই জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ ও বেহেশতের নিয়ামত-সমূহ লাভ করতে পারবে)। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর, (তবে তোমাদেরই ক্ষতি হবে)। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সা)-এর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আসমানে

ও যমীনে যা কিছু (আছে) সবই আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাধীন। (কাজেই এতবড় পরাক্রমশালী মালিকের কি ক্ষতি হবে? এখনও সময় আছে, নিজের কল্যাণের চেষ্টা কর)। আর আল্লাহ্ তা'আলা (সকলের ঈমান ও কুফরী সম্পর্কে) সবই জানেন (কিন্তু তিনি দুনিয়ায় পূর্ণ শাস্তি দান করেন না। কারণ, তিনি) সুবিবেচক (ও বটে। তাই তাঁর প্রজ্ঞার চাহিদা অনুসারে দুনিয়াতে পূর্ণ শাস্তি দান করেন না)।

يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ ط إِنَّمَا
الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ج أَلْقٰهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ
مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ج وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ط اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط
إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط سُبْحٰنَهٗ أَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ق لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

(১৭১) হে আহ্লে-কিতাবগণ! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্র শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম-পুত্র মসীহ্ ঈসা আল্লাহ্র রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ্— তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে এবং তাঁর রসূলদের মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদীদের সম্বোধন করে তাদের গোমরাহীর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এবারে খৃস্টানদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা ও হযরত ঈসা মসীহ (আ) সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও বাতিল আকীদাসমূহ খণ্ডন করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আহলে-কিতাব (অর্থাৎ ইঞ্জীল কিতাবের অধিকারী নাসারা খৃস্টানগণ)! তোমরা নিজেদের ধর্মীয় ব্যাপারে (সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের উপর) বাড়াবাড়ি করো না, এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে ভুল কথা বলো না (যে, তাঁর পরিবার-পরিজন রয়েছে---নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক)। যেমন কেউ কেউ বলতো إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٌ (অর্থাৎ উপাস্য তিনজন) তন্মধ্যে আল্লাহ অন্যতম; অবশিষ্ট দু'জন অংশীদারের একজন হযরত মসীহ

(আ) ও অপরজন সম্পর্কে কেউ বলতো---হযরত জিবরাঈল (আ) যার উপাধি ছিল রূহুল কুদ্‌স বা পবিত্রাত্মা। وَلَا الْمَلٰٓئِكَةَ الْمُقَرَّبُوْنَ আয়াতে তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। আর কেউ মনে করতো, হযরত মরিয়ম (আ)। যেমন ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ আয়াতে তাদের ভ্রান্ত আকীদা বাতিল করা হয়েছে। অন্য একটি উপদল হযরত ঈসা মসীহ (আ)-কে স্বয়ং আল্লাহ্ মনে করতো। যেমন اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রত্যেকটি আকীদা অতিরঞ্জিত, ভিত্তিহীন ও বাতিল। (বস্তুত) আর কিছুই নয় (বরং হযরত ঈসা) মসীহ ইবনে মরিয়ম (আ) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রসূল এবং তাঁর (সৃষ্টির) কলেমা, (বা অপার নিদর্শন)। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা (হযরত জিবরাঈল [আ]-এর মাধ্যমে হযরত) মরিয়ম (আ)-এর কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং (তিনি) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক রূহ্ (বিশিষ্ট মখলুক মাত্র। যা হযরত জিবরাঈল [আ]-এর ফুৎকারের মাধ্যমে হযরত মরিয়মের দেহাভ্যন্তরে পৌঁছান হয়েছিল। সুতরাং তিনি খোদা বা খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা ছিলেন না। অতএব এসব বাতিল। আকীদা ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা হতে তওবা কর) এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ও তাঁর (সব) রসূলদের প্রতি (তাঁদের শিক্ষা অনুসারে) পুরোপুরি ঈমান আন। (আর ঈমানের ভিত্তি তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই, একত্ববাদকে বিশ্বাস কর), এবং (এমন কথা) বলো না যে, আল্লাহ্ তিনজন। (উদ্দেশ্য, শিরক হতে বিরত রাখা। কেননা, নাসারাদের প্রত্যেকটি উপদল শিরকের মধ্যে সমানভাবে লিপ্ত ছিল। অতএব, তাদের প্রতি কঠোর নির্দেশ হচ্ছে—সর্বপ্রকার শিরক হতে) বিরত থাক, তোমাদেরই মঙ্গল হবে, (এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে স্বীকার কর, কেননা) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই অদ্বিতীয় মা'বুদ—এতে কোন সন্দেহ নেই। সন্তানাদি হতে তিনি পবিত্র ; আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাধীন। (সন্তানাদি হতে পবিত্র হওয়া ও সবকিছুর মালিক হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের একটি প্রমাণ। এবং আরেকটি প্রমাণ এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা (একাই যে কোন) কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট (পক্ষান্তরে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য সবাই নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষিত কার্য সম্পাদনের জন্য অসম্পূর্ণ ও পরমুখাপেক্ষী। এমনকি এক পর্যায়ে উপনীত হয়ে অপারকও হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার অনন্য-নির্ভরতাই তাঁর গুণাবলীর পরিপূর্ণতার প্রমাণ। পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী হওয়া মা'বুদ এর জন্য অপরিহার্য শর্ত। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে যখন তখন তা পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য কেউ মা'বুদও হতে পারে না। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদ বা একত্ববাদই সপ্রমাণিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَلِمَتُهٗ শব্দে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র কালেমা। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন।

(এক) হযরত ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ কোন শিশুর জন্ম লাভের জন্য দু'টি শক্তির যৌথ ভূমিকা থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো---নারী পুরুষের বীর্যের সম্মিলন। দ্বিতীয় শক্তি আল্লাহ্ তা'আলার كن (হও) নির্দেশ দেওয়া ; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সঞ্চার হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আ)-র জন্ম লাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই দ্বিতীয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে কালেমাতুল্লাহ্ বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য এই যে, তিনি বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার كن (হয়ে যাও) নির্দেশের প্রভাবে জন্মলাভ করেছেন। এমতাবস্থায় القاها الى مريم বাক্যের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ কালেমাটি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মরিয়মের কাছে পৌঁছে দিলেন, আর হযরত ঈসা (আ)-র জন্মগ্রহণের মাধ্যমে উহা কার্যকরী ও বাস্তবায়িত হলো।

(দুই) কারো মতে 'কালেমাতুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র সু-সংবাদ। এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-র ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মরিয়ম (আ)-কে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে যে সু-সংবাদ দান করেছিলেন, সেখানে 'কালেমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ এবং ফেরেশতারা বললো---হে মরিয়ম ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে সু-সংবাদ দিতেছেন 'কালেমা' সম্পর্কে।

(তিন) কারো মতে এখানে 'কালেমা' অর্থ নিদর্শন। যেমন অন্য এক আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا

وروح منه----এ শব্দের দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত হযরত ঈসা (আ)-কে 'রূহ্' বলার তাৎপর্য কি ? দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি ?

এ সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে--- (এক) কারো মতে 'রূহ্' অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। কেননা, প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, কোন বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বোঝাবার জন্য তাকে সরাসরি 'রূহ্' বলা হয়। হযরত ঈসা (আ)-র জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোন দখল ছিল না, বরং তিনি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা এবং كن নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি অতি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে

'রূহ্' বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন মসজিদের সম্মানার্থে তাকে 'আল্লাহ্র মসজিদ' বলা হয়, কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র ঘর বলা হয়; অথবা কোন একান্ত অনুগত বান্দাকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করে আবদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র বান্দা বলা হয়। যেমন সূরা বনী-ইসরাঈলের ১ أسرى بعبد আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'আল্লাহ্র বান্দা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(দুই) কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় অন্তরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন রূহ বা প্রাণ, তদ্রূপ হযরত ঈসা (আ) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণস্বরূপ। অতএব, তাঁকে 'রূহ্' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا আয়াতে পবিত্র কোরআনকেও 'রূহ্' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। কেননা কোরআন পাক আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল।

(তিন) কেউ বলেন---'রূহ্' শব্দটি রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থই অধিক সমীচীন। কারণ, হযরত ঈসা (আ)-র নজীরবিহীন ও বিস্ময়কর জন্ম আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য। এজন্যই তাঁকে 'রূহুল্লাহ্' বলা হয়।

(চার) কারো অভিমতে---এখানে একটি ذو শব্দ উহ্য রয়েছে। আসলে ছিল ذُو رُوحٍ مِّنْهُ-----অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হতে রূহ্বিশিষ্ট। প্রাণবিশিষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে সব প্রাণীই সমান। তাই হযরত ঈসা (আ)-র মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

(পাঁচ) আরেকটি অভিমত এই যে, روح (রূহ্) শব্দ ফুঁ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত মরিয়ম (আ)-এর গলাবক্ষে ফুঁ দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আ) শুধু ফুঁৎকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে 'রূহুল্লাহ্' খেতাব দেওয়া হয়েছে। কুরআন পাকে এদিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র সত্তার অংশ ছিলেন বা আল্লাহ্ই ঈসা (আ)-র মানবীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন---এমন অর্থ করা বা ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল।

একটি ঘটনা ঃ আল্লামা আলুসী (র) লিখেছেন যে, একদিন খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে জনৈক খৃস্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হল। সে বলল---তোমাদের কোরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র অংশ ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ সে কোরআনের وروح منه শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেদী কুরআন পাকের অন্য আয়াত

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

পাঠ করলেন। এখানে جَمِيعًا مِّنْهُ শব্দ দ্বারা সব কিছুকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যার অর্থ আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে। অতএব وروح منه শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র অংশ, তবে جميعا منه শব্দের অর্থ করতে হবে আসমানে ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্‌র অংশ (নাউযুবিল্লাহে মিন্ যালেকা)। অতএব, হযরত ঈসা (আ)-র বিশেষ কোন মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খৃস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

وَلَا تَقُولُوا ثَلٰثَةٌ—কোরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খৃস্টানরা যেসব উপদলে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করতো---মসীহ্‌ই খোদা। স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো---মসীহ্ খোদার পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্য সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার। এ দলটি আবার দু'টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মরিয়ম—এ তিনের সমন্বয়ে এক খোদা। অন্য এক দলের মতে, হযরত মরিয়ম (আ)-এর পবিবর্তে রূহুল কুদ্‌স পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (আ) ছিলেন তিন খোদার একজন।

মোট কথা, খৃস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ্ (আ)-কে তিনের এক খোদা মনে করতো। তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কোরআন করীমে প্রতিটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হল হযরত ঈসা মসীহ (আ), তাঁর মাতা হযরত মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ্ তা'আলার সত্য রসূল। এর অতিরিক্ত যা কিছু বলা বা ধারণা পোষণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইহুদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খৃস্টানদের মত অতি-ভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদী ও খৃস্টানদের পথভ্রষ্টতা

দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হযরত ঈসা (আ)-র উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তির দু'টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায়ের সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

খৃস্টানদের বিভিন্ন উপদলের ভ্রান্ত আকীদার বিভিন্ন দিক ও তার মোকাবিলায় ইসলামী আকীদার সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সবিস্তারে জানার জন্য মরহুম হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানুভী সাহেব কর্তৃক সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'এজহারুল হক্ক' অধ্যয়ন করা যেতে পারে। বইটি মূল আরবী হতে উর্দু তরজমায় প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যাসহ সম্প্রতি করাচী দারুল উলুম হতে তিন জিলদে প্রকাশিত হয়েছে।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا -

অর্থাৎ আসমানে ও যমীনে উপর হতে নিচে পর্যন্ত যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা! অতএব, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা একাই সর্ব কার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না।

সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেক বর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট কোন জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম ঃ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ—আয়াতে ইহুদী-নাসারাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। غلو শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম জাস্‌সাস 'আহকামুল-কোরআন'-এ লিখেছেন ঃ

الغلو فى الدين هو مجاوزة حد الحق فيه

অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে غلو (বাড়াবাড়ি) করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমারেখা অতিক্রম করা!

আহ্‌লে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টান—উভয় জাতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে ইহুদীরা তাকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র নবী হিসাবে স্বীকার করেনি,

বরং তাঁর মাতা হযরত মরিয়ম (আ)-এর উপর (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেকা) মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর নিন্দা করেছে।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘনের কারণে ইহুদী ও খৃস্টানদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বারবার প্রত্যক্ষ হয়েছে, তাই হযরত রসূলে করীম (সা) তাঁর প্রিয় উম্মতকে এ ব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। মসনদে আহমদে হযরত ফারুক আযম (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لاتطرونی کما اطرت النصاری عیسیٰ بن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله-

অর্থাৎ 'তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করো না, যেমন খৃস্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর ব্যাপারে করেছে। খুব স্মরণ রাখবে যে, আমি আল্লাহ্র পূর্ণ বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রসূল বলবে।' বোখারী ও ইবনে মাদয়িনী এ হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ্ বলেছেন।

সারকথা, আল্লাহ্র বান্দা ও মানুষ হিসাবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহ্র রসূল। এর চেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার কোন বিশেষণে বিভূষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইহুদী-নাসারাদের মত বাড়াবাড়ি করো না। বস্তুত ইহুদী-খৃস্টানরা শুধু নবীদের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ক্ষান্ত হয়নি বরং এটা যখন তাদের স্বভাবে পরিণত হলো, তখন তারা নবীদের সহচর অনুগামীদের ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ করেছিল, পাদ্রী-পুরোহিতদেরও তারা নিষ্পাপ মনে করতো। অতঃপর এতটুকু যাচাই করাও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে নবীদের অনুগত এবং তাঁদের শিক্ষার অনুসারী, না শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে পণ্ডিত-পুরোহিতরূপে পরিগণিত হন। ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন পাদ্রী-পুরোহিতদের কুক্ষিগত হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিভ্রান্তি গোমরাহীর আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ধর্মকর্মের নামে তারা অধর্ম অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কোরআন পাক ঘোষণা করছে ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ — অর্থাৎ

"তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের মা'বুদের আসনে বসিয়েছিল।" রসূলকে তো খোদা বানিয়েছিলই, রসূলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবীদেরও পূজা করা শুরু করেছিল।

এর থেকে বোঝা গেল যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার রূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের প্রিয়নবী (সা) স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজ্বের সময় রমীয়ে জামারাহ্ অর্থাৎ কংকর নিক্ষেপের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে কংকর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারি আকারের পাথরকুচি নিয়ে এলে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) সেটা অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন ঃ —بمثلهن بمثلهن অর্থাৎ এ ধরনের মাঝারি আকারের কংকর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়। বাক্যটি-তিনি দু'বার বললেন। অতঃপর আরো বললেন ঃ

ايا كم والغلو فى الدين فانما هلك من قبلكم بالغلو فى دينهم-

অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে দূরে থেকো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জানা গেল।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ঃ প্রথমত হজ্বের সময় যে কংকর নিক্ষেপ করা হয় তা মাঝারি আকারের হওয়াই সুন্নত। অতি ক্ষুদ্র বা বড় পাথর নিক্ষেপ করা সুন্নতের পরিপন্থী। বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ির শামিল।

দ্বিতীয়ত রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কাজের যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটিই শরীয়তের নির্ধারিত সীমা। সেটা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়িরূপে পরিগণিত হবে।

তৃতীয়ত যে কোন কাজে সুন্নতসম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়িরূপে বিবেচনা করতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বতের সীমা ঃ পার্থিব ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কোরআন পাকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্থিব মোহ সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে রসূলে করীম (সা) স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা তার সীমারেখাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বিয়ে করাকে তিনি নিজের সুন্নত বলে ঘোষণা করেছেন। বিয়ে করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, সন্তান জন্মদানের উপকারিতা বুঝিয়েছেন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে 'ফরিযাতুন বা'দাল ফরিযা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, কৃষিকার্য, শিল্প কর্ম, হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনটাই দুনিয়ার মহব্বতের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে নবুয়তের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব উপদ্বীপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে সে রাষ্ট্রের এলাকা বহু দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছিল, অথচ তাঁদের অন্তরে দুনিয়ার কোন মোহ ছিল না। এতদ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে এসব করা নিন্দনীয় নয়।

ইহুদী ও খৃস্টানরা এ তত্ত্বটি অনুধাবন করতে অপারক হওয়ায় সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

অর্থাৎ তারা নিজেদের পক্ষ হতে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছে যা আমি তাদের প্রতি আরোপ করিনি। অতঃপর তারা তা যথাযথভাবে বজায় রাখেনি।

সুন্নত ও বিদ'আতের সীমারেখা ঃ ইবাদত, লেনদেন, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রসূলে পাক (সা) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পেছনে অবস্থান যেমন অবাঞ্ছনীয়, তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমার্জনীয়। এজন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রকার বিদ'আতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار— অর্থাৎ প্রতিটি বিদ'আতই গোমরাহী আর প্রতিটি গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম। রসূলে মকবুল (সা)-এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় না, এরূপ কোন বিষয়কে সওয়াবের কাজ মনে করাই বিদ'আত।

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহ্লবী (র) লিখছেন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আতকে চরম অপরাধ এজন্য বলা হয়েছে যে, এটাই দীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও চিরাচরিত পন্থা। পূর্ববর্তী উম্মতদেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও রসূলদের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করেছিল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা কি কি বর্ধিত করেছে আর আসল রূপরেখা কি ছিল, তা জানারও কোন উপায় ছিল না।

দীনকে বিকৃত করার কারণ ও পন্থাসমূহ কি কি, কোনও গুপ্তপথে যাতে এ মহামারী উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন্য ইসলামী শরীয়তে কিভাবে প্রতিটি পথে সতর্ক ও শক্তিশালী প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলবী (র) তদীয় 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা ঃ উক্ত কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবীয়ে-করীম (সা)-এর কঠোর হুঁশিয়ারি এবং শরীয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষণ সুস্পষ্ট ও উদ্বেগজনক। দীন ও ঈমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য অথবা অবহেলা ও

অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করেছে যে, ধর্মীয় আলিম-উলামা, পীর-বুযুর্গানের কোন প্রয়োজনই নেই। আল্লাহ্‌র কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ তাঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। এ মনোভাবাপন্ন কোন কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আরবী ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, কোরআনের হাকীকত ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া সত্ত্বেও শুধু কয়েকটি অনুবাদ পুস্তক পাঠ করেই নিজেকে কোরআনের সমঝদার মনে করে বসেছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ সাহাবায়ে-কিরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তফসীরের তোয়াক্কা না করে নিজেদের কল্পনাপ্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, ওস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো, তবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিলেন— রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহ্‌র কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রের বই-পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারে নি। প্রকৌশলবিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোন পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শোনা যায় না। এমন কি দর্জিবিদ্যা বা পাক-প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোন সুদক্ষ দর্জি বা বাবুর্চি হতেও দেখা যায় না, বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজনস্বীকৃত। অথচ তারা কোরআন-হাদীসকে এত হালকা মনে করেছে যে, এগুলো বোঝার জন্য কোন ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা সত্যি পরিতাপের বিষয়।

অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক এমন গড্ডালিকা প্রবাহে মেতে উঠেছে যে, তাদের ধারণা, কোরআন পাক বোঝার জন্য তর্জমা অধ্যয়নই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী মনীষীদের তফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা বা তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। আদতে এটাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা।

অপর দিকে বহু মুসলমান অন্ধ ভক্তিজনিত রোগে আক্রান্ত। যাকে তাদের পছন্দ হয়েছে, তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে না যে, আমরা যাকে নেতারূপে অনুসরণ করছি তিনি ইলম-আমল, ইসলাহ্ ও পরহিযগারীর মাপকাঠিতে টেকেন কিনা? তারা যে শিক্ষা দিচ্ছেন, তা কোরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক কিনা? প্রকৃতপক্ষে এহেন অন্ধভক্তিও বাড়াবাড়িরই নামান্তর।

বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামী শরীয়তের পথ-নির্দেশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র কিতাব আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকদের চিনতে হবে অর্থাৎ প্রথমে কোরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের আলোকে খাঁটি আল্লাহ্‌ওয়ালাদের চিনে নাও। অতঃপর দেখ, তাঁরা কোরআন ও হাদীসের চর্চায় সদা নিমগ্ন এবং তাঁদের জীবনধারাও কোরআন-হাদীসের রঙে রঞ্জিত কিনা। অতঃপর কোরআন ও হাদীসের সব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজের বুঝ-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তার অনুসরণ করতে হবে।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ
وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ
جَمِيْعًا ﴿١٧٢﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ
وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧٣﴾

(১৭২) মসীহ্ আল্লাহ্র বান্দা হবেন, তাতে তাঁর কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুত যারা আল্লাহ্র দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন। (১৭৩) অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। আল্লাহ্কে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[খৃস্টানরা অনর্থক হযরত ঈসা (আ)-কে খোদা বা খোদার অংশ বলে চালাতে চায়, অথচ হযরত ঈসা মসীহ্ (আ) পৃথিবীতে অবস্থানকালে নিজেকে আল্লাহ্র বান্দা বলে প্রচার করেছেন যার ফলে তাঁর খোদা বা খোদার অংশ হওয়ার মতবাদ ভ্রান্ত ও বাতিল প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু ধরাপৃষ্ঠে অবস্থানের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের এবং উচ্চ মর্যাদার পরিচায়ক বর্তমানে আসমানে অবস্থানকালে তথা কিয়ামত পর্যন্ত তিনি যখন যেখানেই থাকেন না কেন, কোন অবস্থাতেই তিনি] আল্লাহ্র বান্দা হতে লজ্জাবোধ করেন না এবং নিকটবর্তী ফেরেশতারাও (কখনও) অপমানবোধ করেন না, [যাদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ)-ও রয়েছেন যাকে তারা তিনের এক খোদা মনে করে]। আর (তাঁরা আল্লাহ্র বন্দেগীতে লজ্জাবোধ করতেই পারেন না। কারণ) যারা আল্লাহ্র বন্দেগী করতে লজ্জাবোধ করবে অথবা অহংকার করবে, (তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে (হিসাব-নিকাশের জন্য কিয়ামতের ময়দানে) নিজের সামনে সমবেত করবেন। অতএব, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দা হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেছে) তিনি তাদের পূর্ণ প্রতিদান দান করবেন (যেমন ঈমান ও আমলের জন্য আশ্বাস দেওয়া হয়েছে)। আর (তাছাড়া) স্বীয় কৃপায় তাদেরকে আরো অধিক (ও অতিরিক্ত নিয়ামত) দান করবেন। (যার বিবরণ বা পরিমাণ বর্ণনা করা হয়নি।) পক্ষান্তরে যারা (গোলামি স্বীকার করতে)

লজ্জাবোধ করেছে এবং অহংকার করেছে, তিনি তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তিদান করবেন এবং তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন দরদী বা সাহায্যকারী (খুঁজে) পাবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্র বান্দা হওয়া সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় ঃ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ

الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ---অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) স্বয়ং এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো আল্লাহ্র বান্দা হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ আল্লাহ্র দাসত্ব ও গোলামি করা, তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। হযরত ঈসা মসীহ (আ) ও হযরত জিবরাঈল (আ) প্রমুখ বিশিষ্ট ফেরেশতা এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাঁদের কোন লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামি করাই লজ্জা ও অমর্যাদার কাজ। যেমন, খৃস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আ)-কে ঈশ্বর-পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে ঈশ্বর-দুহিতা ও দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরী করে পূজা অর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত রয়েছে।---(ফাওয়ায়েদে-উসমানী)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾

(১৭৪) হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি। (১৭৫) অতএব, যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার মত সরল পথে তুলে দেবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে (সমগ্র) মানব (জাতি)! নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক (যথার্থ) সনদ [অর্থাৎ রসূলে পাক (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্ব] এসে পৌঁছেছে। আর আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি এক উজ্জ্বল নূর (বা আলোকবর্তিকা, আর তা হল—পবিত্র কোরআন। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে

যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, তা সবই সত্য ও সঠিক, যার মধ্যে ইতিপূর্বে বর্ণিত বিষয়বস্তু-সমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে]। অতএব, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে, (অর্থাৎ একত্ববাদ ও সন্তানাদি হতে পবিত্র হওয়া স্বীকার করেছে) এবং তাকে (অর্থাৎ তাঁর মনোনীত দীন ইসলামকে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে, [অর্থাৎ কোরআনের শিক্ষা ও রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র আদর্শকে পুরাপুরি মেনে নিয়েছে ও অনুসরণ করেছে] তাদেরকে তিনি (আল্লাহ্‌ তা'আলা) অচিরেই স্বীয় রহমতের মধ্যে (বেহেশতে) দাখিল করাবেন এবং স্বীয় ফযল বা অনুগ্রহে (আরো বহু বিশিষ্ট নিয়ামত দান করবেন), তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র দিদার বা সরাসরি দর্শন অন্যতম এবং তাঁর কাছে পৌঁছার সরল পথ প্রদর্শন করবেন অর্থাৎ পার্থিব জীবনে তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্য ও ন্যায়ের পথে স্থির ও অবিচল রাখবেন। এতদ্বারা ঈমান ও সৎকার্য বর্জনকারীদের অবস্থাও জানা গেল যে, তারা এসব সুফল ও সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ——'বুরহান' শব্দের আভিধানিক অর্থ অকাট্য দলীল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে। ---(তফসীরে রূহুল-মা'আনী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তাঁর বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মো'জেযাসমূহ, তাঁর প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তাঁর রিসালতের অকাট্য দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যার পরে আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

আলোচ্য আয়াতে نُور (নূর) শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে। (রূহুল-মা'আনী) যেমন সূরায়ে মায়েদার আয়াত ঃ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ——অর্থাৎ তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল আলো এসেছে, আর তা হচ্ছে এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ কোরআন।—(বয়ানুল-কোরআন)

এই আয়াতে যাকে 'কিতাবুম-মুবীন' বলা হয়েছে, অন্য আয়াতে তাকেই 'নূরুম্‌ মুবীন' বলা হয়েছে।

আবার নূর অর্থ রসূলুল্লাহ্‌ (সা) এবং কিতাব অর্থ আল-কোরআনও হতে পারে। (রূহুল-মা'আনী) তবে তার অর্থ এ নয় যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) মানবীয় দৈহিকতা হতে পবিত্র শুধু নূর ছিলেন।

يَسْتَفْتُوْنَكَ ۖ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۚ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ
لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ
لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانُوْٓا
اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

(১৭৬) মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়—অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদের 'কালালাহ্'-এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন; যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন পুত্র-সন্তান না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তার দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ্ তোমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

যোগসূত্র ঃ সূরায়ে নিসা শুরু করার অব্যবহিত পরেই মীরাসের হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর প্রায় এক পারা পরে মীরাসের মাস'আলা-মাসায়েলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরিশেষে সূরার উপসংহারে আবার একবার মীরাসের মাসায়েলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে মীরাস বন্টনে অত্যন্ত অবিচার করা হতো। তাই সুষ্ঠুভাবে তা বন্টন করার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য সূরার শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে—তিনবার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মীরাসের মাসায়েল তিন স্থানে বিভক্ত করার হয়ত এটাই রহস্য ও তাৎপর্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

লোকে আপনার কাছে ('কালালাহ্র মীরাস' সম্পর্কে অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির পিতামাতা ও সন্তানাদি নেই, কিন্তু ভাই-বোন রয়েছে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কে) নির্দেশ জানতে চায়; (তদুত্তরে) আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের 'কালালাহ্' সম্পর্কে এই ফয়সালা দিচ্ছেন (যে,) যদি কোন ব্যক্তি মারা যায়, যার (পিতামাতা ও) সন্তানাদি নেই এবং তার শুধু একজন (সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী) বোন থাকে তবে উক্ত বোন তার পরিত্যক্ত (সমুদয়) সম্পদের অর্ধেক পাবে, (অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হকসমূহ আদায় করার পরে। অবশিষ্ট অর্ধেক আসাবাদের দেওয়া হবে যদি কেউ থাকে। অন্যথায় তাও উক্ত

বোনকে দেওয়া হবে)। আর উক্ত ব্যক্তি (জীবিত থাকলে) তার বোনের সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে, যদি (সে মারা যায় এবং) তার সন্তানাদি না থাকে; (এবং পিতা-মাতাও না থাকে)। আর যদি (মৃত ব্যক্তির) দু'জন (বা ততোধিক) বোন থাকে, (তবে তারা সমুদয়) পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসাবা-দের জন্য এবং আসাবাদের অবর্তমানে পুনরায় বোনেরা পাবে। আর যদি (পুত্র-কন্যা, পিতামাতাহীন) কোন পুরুষ বা নারী মৃত ব্যক্তির (একই সম্পর্কের) কয়েকজন নারী-পুরুষ (অর্থাৎ ভাই-বোন) ওয়ারিস থাকে, তবে (পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম এই যে,) প্রত্যেক পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমপরিমাণ অর্থাৎ ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ। তবে সহোদর ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই বোন বাদ পড়বে আর সহোদর বোন থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই বোন তখন তাদের অংশ কম করে পাবে (এ সম্পর্কে বিস্তারিত মাসায়েল ফারায়েযের কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে)। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য (ধর্মীয় বিধি-বিধান) স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন যেন তোমরা বিপথগামী না হও (এটা আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী ও সতর্কবাণী)। আর আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু সম্পর্কে অতি জ্ঞানবান। (অতএব, বিধি-বিধানের উপকারিতা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যাবতীয় হুকুম-আহকাম দান করেন)।

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ এখানে আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং 'কালালাহ্'র হুকুম বর্ণনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় জানা গেল।

প্রথমত وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

বলার পর দৃষ্টান্তস্বরূপ আহ্লে-কিতাবের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তদ্রূপ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ —আয়াতে রসূলে করীম (সা)-এর সাহাবায়ে কিরামের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, যাতে করে ওহী হতে যারা পরাঙমুখ তাদের পথ-ভ্রষ্টতা ও সর্বনাশ এবং ওহীর আনুগত্য ও অনুসরণকারীদের সত্যনিষ্ঠা এবং সততা সুস্পষ্ট-ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, আহ্লে-কিতাবরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার জন্য অংশীদার ও পুত্র সাব্যস্ত করার মত হীন মানসিকতাকে নিজেদের ঈমানের অঙ্গ বানিয়েছে। হঠকারিতার সাথে আল্লাহ্র ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অপর দিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবায়ে-কিরামের ধর্মীয় মূলনীতি ও ইবাদত তো দূরের কথা, লেনদেন, আচার-ব্যবহার, বিবাহ-শাদী এমন কি মীরাস বন্টনের মত ব্যাপারেও নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে যথেষ্ট মনে

করতেন না, বরং সর্ব ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। যদি একবারে সান্ত্বনা না পেতেন তবে আবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে হাযির হয়ে জানতে চাইতেন।

তৃতীয়ত আরো বোঝা গেল যে, হযরত সাইয়্যেদুল-মুরসালীন (সা) ওহীর হুকুম ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোন আদেশ জারি করতেন না। যদি কোন ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন ওহী না থাকতো, তবে তিনি ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। এখানে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহ্লে-কিতাবদের আবদার অনুসারে ওহী এক সাথে নাযিল না হয়ে যথাসময়ে অল্প অল্প নাযিল হওয়া অতি উত্তম। কারণ এমতাবস্থায় যে কোন ব্যক্তি নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্ন করার সুযোগ পায় এবং ওহীর মাধ্যমে জবাব জানতে পারে। যেমন এই আয়াতে এবং কোরআন মজীদের আরো বহু আয়াতে তার নজীর দেখতে পাওয়া যায়।

এ ব্যবস্থাটি অধিক উপকারী ও কার্যকরী। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ ও সম্বোধন করা বান্দার জন্য অতি সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়, যা পূর্ববর্তী উম্মতরা হাসিল করতে পারেনি। وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

যে কোন সাহাবীর কল্যাণার্থ বা যার প্রশ্নের উত্তরে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, উক্ত আয়াত তাকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছে। আর মতভেদ হলে যার বক্তব্য অনুসারে ওহী নাযিল হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত চিরদিন তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় থাকবে। যা হোক, 'কালালাহ্' সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করে উপরোক্ত সমাধানসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।---(ফাওয়ায়েদে-উসমানী)

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/১৪৮৪(উ)—৫,২৫০